



উত্তরসূরি

মাসিক বৈঠকী মুখপত্র।। এক ।। ২৬ জুলাই ২০২৫

কাজী নজরুল ইসলাম আলোচনা সংখ্যা



‘উত্তরসূরি’র প্রথম সাহিত্য আড্ডা: সাম্যের মন্ত্রে পথচলার সূচনা

আলো যখন শব্দ ছুঁয়ে যায়, তখন সে কেবল আলোকপ্রভা নয়—
তখন সে হয়ে ওঠে মেধা, মনন ও মানবিকতার অন্তঃশ্রোত।
‘উত্তরসূরি’র প্রথম সাহিত্য আড্ডা ছিল ঠিক এমনই এক আলোর জলবিন্দু,
যা ধরা পড়ল একটি সজীব বিকেলের সাংস্কৃতিক শ্রোতধারায়।
২৮শে জুন, ২০২৫—
শনিবারের এক হৃদয়মধুর সন্ধ্যায়, করিমগঞ্জ জেলার শ্রীভূমির পটভূমিতে
ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের আতিথ্যপূর্ণ বাসভবনে আয়োজন করা হয়
‘উত্তরসূরি’র প্রথম মাসিক সাহিত্য আড্ডার।
কেন্দ্রে ছিলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম—
যিনি কেবল বাংলার কবি নন, তিনি বিপ্লবের সুর, সাম্যের কবি, এক
অসাম্প্রদায়িক চেতনার জীবন্ত উজ্জ্বল আলো।
সেই সন্ধ্যার সূচনা হয় এক অনুপম পরিবেশনায়—
নজরুলের রচিত গান “জল তরঙ্গে ঝিল মিল ঝিল মিল ঢেউ তুলে সে যায়...”
যা সুরে ভাসিয়ে তোলে অনুষ্ঠানের অন্তরাত্মা।
এই সংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী অলকা চক্রবর্তী,
যার কণ্ঠে গানের সুর যেন মিলেমিশে যায় বাংলার নদী, আকাশ, আর
দিগন্তের কোলাহলে।
এরপরই আলোকপাত করেন ‘উত্তরসূরি’র প্রধান কর্ণধার,
ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য—
যার প্রাঞ্জল বক্তৃতা আমাদের সামনে নতুন করে হাজির করল
“আজকের দিনে নজরুল কেন?” এই জরুরি প্রশ্ন।
তিনি বলেন,
“নজরুল কেবল বিপ্লবের প্রতীক নন, তিনি দ্রোহ আর ভালোবাসার
সমন্বেষে গড়া এক মহাকাব্যিক কণ্ঠস্বর—
যিনি হিন্দু-মুসলিম ভেদ ভুলে, জাতপাত-ধর্ম-বর্ণের গণ্ডি ছিঁড়ে
সমাজকে দিতে চেয়েছিলেন এক মানবিক সহাবস্থানের পথনির্দেশ।”
এই বক্তব্য আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠে কিছু চিন্তাশীল হৃদয় ব্যক্তিতে—
যাঁরা ছিলেন এ আড্ডার সক্রিয় অংশগ্রহণকারী—
যাঁদের চোখে মুখে জ্বলছিল সাহিত্য আর সমাজ ভাবনার আলো।
সেই আলোতেই জ্বলে ওঠে এক কবির স্বরচিত কবিতা—
ড. অপিতা দাস পাঠ করেন তাঁর লেখা নজরুলকে উৎসর্গীকৃত কবিতা—
“তুমি চলে গিয়েছে নীরবে,
আবার যদি আসতে তুমি গাইতে সাম্যের গান...”
এই পংক্তিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে কবির আতি—
যেন সময়ের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কবিতা হাত বাড়িয়ে ডাকে
একটি নতুন আলোকের জন্য।
এরপর এক মর্মস্পর্শী বক্তৃতা রাখেন সাহিত্যিক রঞ্জন ভট্টাচার্য।
তিনি নজরুলের বহুমাত্রিক রচনার প্রবাহকে বিশ্লেষণ করেন—
শ্যামাসংগীত, কীর্তনধারা এবং ইসলামী ভাবনার সংমিশ্রণে

নজরুল কীভাবে তৈরি করেছিলেন এক সাংস্কৃতিক সাম্যচেতনার সেতুবন্ধ।
তিনি বলেন,
“নজরুল ছিলেন সময়ের আণ্ডয়ান কণ্ঠ। তিনি যদি কীর্তনে মাতেন,
তেমনি আজানে সাড়া দেন।
তাঁর কাছে দেবী দুর্গা ও মা ফাতেমা— উভয়েরই সমান স্থান।”
এই গভীর বিশ্লেষণের পর ফের সুরে সুরে গেয়ে ওঠেন অলকা চক্রবর্তী,
নজরুলের কালজয়ী শ্যামাসংগীত ‘মা কি আমার কালো রে’,
যা গেয়ে ওঠে সকলের কণ্ঠে—
সেই গানে মিশে যায় মাতৃভাব, সমাজচেতনা ও নান্দনিক একাত্মতা।
এরপর আজিজুল সেখ তাঁর শক্তিশালী কণ্ঠে পরিবেশন করেন নজরুলের
কবিতা ‘সাম্যবাদী’—
যেখানে উচ্চারিত হয় এক চিরায়ত বিপ্লবী মন্ত্র:
“আমি চিরতরে হ্রস্ব করিব যত ভেদাভেদ!”
এই কবিতা যেন মুহূর্তে সময়কে ছাপিয়ে দাঁড়ায়—
এ এক প্রতিশ্রুতি,
যে কবিতায়, সাহিত্যে, মননে, সমাজে, আমরা ফিরে চাই
সেই চেতনা, যা সকল ভেদ-বিভেদ-বিদ্বেষকে অতিক্রম করে
এক মানবিক সমাজ গড়তে চায়।
অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের কণ্ঠে
নজরুলের অমর কবিতা ‘বিদ্রোহী’র অংশবিশেষ আবৃত্তির মাধ্যমে।
তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়—
“আমি চির বিদ্রোহী বীর – বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা রণ ক্লাস্ত বীর!”
এই উচ্চারণ যেন পুরো আড্ডা জুড়ে ছড়িয়ে দিল এক আশুনিখরা আবেগ।
এই সাহিত্য আড্ডা শুধু কবিতার আড্ডা ছিল না,
এ ছিল একটি মূল্যবোধভিত্তিক সামাজিক সূচনা।
‘উত্তরসূরি’ তার নামের মতোই উত্তরাধিকার বহন করছে—
প্রগতিশীল চিন্তার, মানবতাবাদের, সাহসী কবিতার উত্তরসূরি হিসেবে।
এই প্রথম সাহিত্য আড্ডায় উপস্থিত ছিলেন আরো উল্লেখযোগ্য
সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব—
চান্দ্রেয়ী দেব, স্পন্দন মুখোপাধ্যায়, মনিদীপা দেব
অম্বিকা দাস পুরকায়স্থ, সৌমিলি ধর, প্রমুখ।
এই সাহিত্যআড্ডা একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল—
একটি অনারকম সাহচর্যের, যার শিকড়ে রয়েছে নজরুলচেতনা।
যেখানে মানুষ থাকবে মানুষের পাশে— ধর্ম, জাত, লিঙ্গের উদ্বেগে উঠে।
যেখানে কবিতা হবে প্রতিরোধের ভাষা, গান হবে সংহতির সুর।
‘উত্তরসূরি’র এই যাত্রা যেন এক সাহসী বীজরোপণ,
যা একদিন হয়ত ফলবে শত সহস্র সাহিত্যের বৃক্ষে—
সেই বৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়িয়ে বলব আমরা সবাই—
“আয়, আরও বেঁধে বেঁধে থাকি।”

(কথাসূত্র: ড. অপিতা দাস)

বিদ্রোহী কবিকে আজিজুল সেখ



এই এখনও হাঁক দিয়ে তিনি জানিয়ে দিলেন আছেন
আমরা কেন বৃথাই ভয়ে মরি?
অকুতোভয় কাভারীকে ডাকেন
ভাসিয়ে দেন বিদ্রোহেরই তরী।

কাজী নজরুল নাম শুধু নয়
খুনে রঙের পলাশ তিনি আঁকেন
ভীরু দুর্বল আমরা যারা, ভয়ে ভয়ে বাঁচি
করতে লড়াই, এখনও তিনি ডাকেন।

আমরা জাগি কবির ডাকে
সুদূর থেকে আজ এখনও
মানবতার বিদ্রোহী সুর
জাগিয়ে রাখে, জাগছে যেন।

সাম্যবাদী চোখগুলো তাঁর
ঠিক তেমনই আছে বিলকুল
ছিলেন আছেন থাকবেন তিনি
আমাদের প্রিয় কাজী নজরুল।

নজরুল ইসলাম: ফিরে দেখা গৃহ পোদ্দার



কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের
২৪শে মে (১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ জৈষ্ঠা)
পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুকলিয়া গ্রামে
জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কাজী ফকির আহমেদ এবং

মাতা জাহেদা খাতুন। তাঁর পিতা কাজী ফকির আহমেদ
ছিলেন স্থানীয় মসজিদের ইমাম ও মাজারের খাদেম। তিনি একাধারে
কবি, সাহিত্যিক, গল্পকার, গীতিনাট্যকার, অভিনয় শিল্পী, সুরকার ও
প্রবন্ধকার। কাজী নজরুল ইসলামের ডাক নাম ছিল হুখু মিয়া। তাঁর
লেখনায় সমাজের অন্যায়, অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার
প্রতিবাদ ছিল যা তৎকালীন সময়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তিনি
ছিলেন বিংশ শতাব্দীর এক অন্যতম বিদ্রোহী ও প্রেমের কবি। বাংলা
সাহিত্যের বিদ্রোহী কবি এবং বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল
ইসলাম ২৯ আগস্ট ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

‘নবযুগে’ সাংবাদিকতার পাশাপাশি নজরুল বেতারে কাজ করছিলেন।
ঠিক সেই সময়ই অর্থাৎ ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন।
এতে তিনি কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। তার অসুস্থতার সম্বন্ধে
জানা যায় ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে। এরপর তাকে মূলত
হোমিওপ্যাথি এবং আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা করানো হয়। কিন্তু এতে তার
শরীরের অবস্থা ঠিক তেমন কোনও উন্নতি হয়নি। কিন্তু সেই সময় তাকে
যদি ইউরোপে পাঠানো হতো তাহলে নিউরো সার্জারি করানো
যেতো। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে তা সম্ভব হয়ে উঠেনি। তিনি
১৯৪২ সালের শেষের দিকে মানসিক ভারসাম্যও হারিয়ে ফেলেন।
রাঁচির এক মানসিক হাসপাতালে কবি এবং কবির স্ত্রীকে পাঠানো হয়।
কবি চার মাস রাঁচিতে ছিলেন। এরপর ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে
চিকিৎসার জন্য কবি নজরুল ও প্রমিলাদেবীকে লন্ডন পাঠানো হয়।
লন্ডনে যাওয়ার পর কাজী নজরুল ইসলামের জন্য বেশ কয়েকজন
চিকিৎসক বিশেষজ্ঞ তার রোগ নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। তাদের মধ্যে

ছিলেন রাসেল ব্রেইন, উইলিয়াম সেজিয়েন্ট এবং ম্যাককিন্স। তারা
কাজী নজরুল ইসলামের সাথে দেখা করেন। রাসেল ব্রেইনের মতে
কাজী নজরুল ইসলামের রোগটি ছিল দুরারোগ্য, এক দিক থেকে বলতে
গেলে তাকে সুস্থ করা ছিল অসম্ভব। একটি গ্রুপ নির্ণয় করেছিল যে, কবি
কাজী নজরুল ইসলাম ‘ইনভলুশনাল সাইকোসিস’ রোগে ভুগছেন।
লন্ডন ক্লিনিকে কোভিড এয়ার এম্বেফালোগ্রাফি নামক এক্স-রে
করানো হয়। এতে দেখা যায় তার মস্তিষ্কের ফ্রন্টাল লোব ছোট হয়ে
গেছে। কাজী নজরুল ইসলামের রিপোর্ট ভিয়েনার বিখ্যাত
চিকিৎসকদের কাছে পাঠানো হয়। এছাড়া নজরুল ইসলামের রিপোর্ট
ইউরোপের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানেও পাঠানো হয়েছিল। জার্মানির বন
বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউরোসার্জন অধ্যাপক রোয়েন্টগেন ম্যাককিন্সের
অপারেশনের বিরোধিতা করেন। ভিয়েনার চিকিৎসকেরাও এই
অপারেশনের বিরুদ্ধে আপত্তি জানান। এক্ষেত্রে তারা সবাই অন্য একটি
পরীক্ষার কথা বলেন যাতে মস্তিষ্কের রক্তবাহগুলির মধ্যে এক্স-রেতে
দৃশ্যমান রং ধরে রক্তবাহগুলির ছবি তোলা হয়। এরপর কবি কাজী
নজরুল ইসলামকে ভিয়েনার চিকিৎসক ডঃ হ্যাস হফের অধীনে ভর্তি
করানো হয়। এই চিকিৎসক ছিলেন নোবেল বিজয়ী চিকিৎসক জুলিয়াস
ওয়েগনার জাউরেগের ছাত্র। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর কবিকে
পরীক্ষা করানো হয়। এর ফলাফল থেকে ডঃ হ্যাস হফ বলেন যে কবি
পিকস ডিজিজ নামক একটি নিউরন গঠিত সমস্যায় ভুগছেন। এই
রোগে আক্রান্তদের মস্তিষ্কের ফ্রন্টাল ও পার্শ্বীয় লোব সংকুচিত হয়ে যায়
ফলে এই রোগে থেকে কবিকে সুস্থ করে তোলা অসম্ভব। ব্রিটিশ
চিকিৎসকেরা নজরুলের চিকিৎসার জন্য বেশি পরিমাণে টাকা
চেয়েছিল যেখানে ইউরোপের কোন চিকিৎসকই কবির কাছ থেকে
টাকা নেননি। স্বল্প সময়ের জন্য কবি ইউরোপ থেকে দেশে ফিরে
আসেন। কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাথে যারা ইউরোপ গিয়েছিলেন
তারা সবাই ১৯৫৩ সালের ১৪ ডিসেম্বর দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

আমার বিদ্রোহীর চোখে চান্দ্রায়ী দেব



মাথায় একঝাঁক কঁোকড়ানো চুল
হুই নয়নে ভেসে ওঠে পটভূমি
সেই চোখে দেখেছি নীলাম্বরীর আঁচল
সেই চোখে দেখেছি প্রভাতীবেলায় ফুরফুরে সকাল
সেই চোখে দেখেছি কবিতার সমাহার ক্লাস্ত হুপুরে
সেই চোখে দেখেছি বিকেলের অস্তিমে
পাখিদের বাড়ি ফেরার গান.....
সেই চোখে দেখেছি জলজল করে জলে সন্ধ্যাবাতি
সেই চোখে দেখেছি জেগে থাকে সারা রাত শেষের সাথি
সেই চোখে দেখেছি আকাশে মেঘের আনাগোনা
সেই চোখে দেখেছি.....
হাওয়ার দোলায় একটুকরো মেঘের উড়ে যাওয়া
সেই চোখে দেখেছি ভয়াবহ বজ্রপাত
সেই চোখে দেখেছি অন্ধকার মুছে আলোর আভা
সেই চোখে দেখেছি.....
বাগানে ছড়ানো শত-শত ফুলের শোভা
সেই চোখে দেখেছি বিদ্রোহের আগুন
সেই চোখে দেখেছি একতার জয়গান।

কাজী নজরুল ইসলামের জীবনী

মনিদীপা দেব



কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, সাহিত্যিক ও সংগীতস্রষ্টা। তিনি আমাদের জাতীয় কবি হিসেবে পরিচিত। তাঁর সাহসী লেখনী ও বিদ্রোহী মনোভাবের জন্য তাঁকে “বিদ্রোহী কবি” বলা হয়। তিনি মানবতা, সাম্য, স্বাধীনতা ও জাতিগত ভ্রাতৃত্বের প্রতীক। কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ সালের ২৪ মে (১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ বঙ্গাব্দ) ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল থানার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম কাজী ফকির আহমেদ এবং মায়ের নাম জাহেদা খাতুন। ছোটবেলায় তাঁর পরিবার আর্থিকভাবে খুবই কষ্টে ছিল। বাবা ছিলেন স্থানীয় মসজিদের ইমাম ও মাজারের খাদেম। ছোটবেলা থেকেই নজরুল কঠোর সংগ্রামের মধ্যে বড় হন। নজরুল মক্তবে পড়াশোনা শুরু করেন। পরে স্থানীয় স্কুলে ভর্তি হন। জীবনের নানা সময়ে তিনি লেটোর দলে গান-বাজনা, অভিনয় ও কবিতা লিখতেন। এর পাশাপাশি তিনি মসজিদে আজান দেওয়া, কবর খোঁড়া এবং হোটеле কাজ করার মতো নানা কাজও করেছেন। ১৯১৭ সালে তিনি ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং করাচি ক্যান্টনমেন্টে কর্মরত ছিলেন। সেনাবাহিনীতে থাকাকালীনও তিনি সাহিত্যচর্চা অব্যাহত রাখেন। সেনাবাহিনী থেকে ফিরে এসে নজরুল সাহিত্যকে পূর্ণ সময় দেন। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত কবিতা “বিদ্রোহী” ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয়, যা তাঁকে বিদ্রোহী কবি হিসেবে পরিচিত করে তোলে। তিনি ১৯২২ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ “অগ্নিবীণা” প্রকাশ করেন।

নজরুলের রচনা:

- কাব্যগ্রন্থ: অগ্নিবীণা, দোলনচাঁপা, বিষের বাঁশি, প্রলয় শিখা।
- গল্পগ্রন্থ: ব্যথার দান। উপন্যাস: বাঁধন হারা, কুহেলিকা।
- গান: নজরুল সংগীত, প্রায় ৪ হাজার গান রচনা ও সুরারোপ করেছেন।

তাঁর সাহিত্য ও সংগীতে ধর্মীয় ভেদাভেদ, জাতি-বর্ণ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ছিল স্পষ্ট। তিনি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির পক্ষে ছিলেন। ১৯৪২ সালে নজরুল গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। দীর্ঘ ৩৪ বছর তিনি নির্বাক ছিলেন। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে সপরিবারে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট ঢাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়। কাজী নজরুল ইসলাম শুধু একজন কবি নন, তিনি বাঙালির আশা, শক্তি ও স্বাধীনতার প্রতীক। তাঁর সাহিত্য ও সংগীত আজও মানুষকে সাহস, প্রেম, প্রতিবাদ ও সাম্যের শিক্ষা দেয়।

অসাম্প্রদায়িক নজরুল : মিলনের মহাকাব্যিক কণ্ঠস্বর

ড. অপিতা দাস



বাংলা সাহিত্য জগতে কাজী নজরুল ইসলাম এক স্বতন্ত্র বিস্ফোরণ—যিনি কেবল বিদ্রোহী কবি নন, বরং অসাম্প্রদায়িক মানবতার এক নির্ভীক কণ্ঠস্বর। যখন উপমহাদেশ সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে ক্ষতবিক্ষত, তখন নজরুল মানুষে মানুষে সেতুবন্ধনের আহ্বান জানানেন তাঁর কলমে, কণ্ঠে ও কাজে। তিনি বলেছিলেন—

“গাহি সাম্যের গান—

যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা, ব্যবধান...”

নজরুলের অসাম্প্রদায়িকতা কোনো রাজনৈতিক কৌশল নয়; তা ছিল তাঁর বিশ্বাস, বেঁচে থাকার দর্শন, শিল্পসাধনার কেন্দ্রবিন্দু।

নজরুল জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে। এক সাধারণ মুসলিম পরিবারে জন্ম নিয়েও তাঁর শৈশবজুড়ে ছিল হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ণের সান্নিধ্য। তিনি বিভিন্ন নাট্যদলে অভিনয় করেছেন, হিন্দু পুরাণের চরিত্রে রূপ ধারণ করেছেন, রামায়ণ-মহাভারতের ছায়ায় বেড়ে উঠেছেন।

এই বহুসংস্কৃতির ছোঁয়া থেকেই জন্ম নেয় তাঁর অসাম্প্রদায়িক মানসিকতা।

বিদ্রোহী কবির কণ্ঠে মানবতার গান

১৯২২ সালে প্রকাশিত ‘বিদ্রোহী’ কবিতা নজরুলকে চিরকালের জন্য ‘বিদ্রোহী কবি’ রূপে চিহ্নিত করে দেয়। কিন্তু এই কবিতার ভিতরে বিদ্রোহ কেবল রাজনীতির বিরুদ্ধে নয়; তা গোঁড়ামির, ধর্মাত্মতার বিরুদ্ধেও—

“আমি চির-বিদ্রোহী বীর—

বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির।”

এই কবিতায় তিনি সকল ধর্ম, জাত, শ্রেণির গম্বুকে অতিক্রম করে এক সর্বজনীন আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠা করেন।

ধর্ম নয়, মনুষ্যত্বই তাঁর আসল ধর্ম

নজরুল একাধিকবার বলেছেন—

“ধর্মের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্য ধর্ম।”

তাঁর “ধর্ম ও মানবতা” প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, “আমি কোনো এক ধর্মের কবি হতে আসিনি, আমি সব ধর্মের, সব মানুষের কবি।” এই ঘোষণা সাহিত্যিক নয়, এক সামাজিক বিপ্লব।

নজরুল প্রায় ৩০০-রও বেশি ইসলামী গজল রচনা করেন। এর মধ্যে রয়েছে নবীপ্রেম, ঈশ্বরভক্তি, সুফি আবেগ, তাওহীদের বাণী। উদাহরণস্বরূপ:

“তালো ও এল্লাহ আল্লাহ, মোহাম্মদ রহুল্লাহ

প্রেমের শরাব পিয়ে মোর প্রাণ উঠিছে ‘ইয়া রাসুল’ বলে।”

এগুলো কেবল ইসলামীয় ভাবপ্রকাশ নয়—তাঁর ভাষা, সংগীত ও ছন্দের এক অসাধারণ মিলন।

নজরুল ইসলাম রচনা করেছেন বহু শ্যামাসঙ্গীত—

“আমার কালো মাকে দেখে কেউ কেউ কয় শ্যামা,

কেউ কয় কালো দয়াময়ী, কেউ কয় তারা-ভামা।”

এই গান শুধুই এক ধর্মের প্রতি সহানুভূতি নয়, বরং এটি এক অভ্যন্তরীণ মিলনের প্রতীক, যা ধর্মকে ভালোবাসায় রূপান্তরিত করে।

তাঁর কাব্যে ঈশ্বর কখনও হর, কখনও আল্লাহ, কখনও ঈশ্বর, কখনও মা কালী। এক কবিতায় তিনি বলেন—

“এক হাতে দোয়েল বাজে, এক হাতে শঙ্খ,

আমি হিন্দু না মুসলমান—আমি গায়িকা গঙ্গা-যমুনা।”

এই দৃষ্টিভঙ্গি নজরুলকে একমাত্র এমন কবি বানিয়েছে যিনি একই সঙ্গে গজল এবং কীর্তনে দীক্ষিত।

সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী বক্তব্য ও প্রবন্ধ

তাঁর ‘হিন্দু-মুসলমান’ প্রবন্ধে নজরুল লিখেছেন—

“হিন্দু যদি মুসলমানকে ঘৃণা করে, তবে সে আমার ভাই নয়।

মুসলমান যদি হিন্দুকে ঘৃণা করে, সেও আমার ভাই নয়।

আমি ভালোবাসি কেবল তাদের, যারা ভালোবাসতে জানে।”

এখানেই কবি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, তাঁর অবস্থান ধর্মীয় দ্বন্দ্ব নয়—মানবতার পক্ষে।

নজরুলের নাটক ‘আলমগীর’, ‘পুতুলের বিয়ে’, ‘বিলিমিলি’ ইত্যাদিতে ধর্ম নয়, চরিত্রের মানবিকতা মুখ্য। উপন্যাস ‘বাদল প্রহরী’ ও ‘কুহেলিকা’তেও তিনি হিন্দু-মুসলিম মিলনের স্বপ্ন একেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন— “নজরুল এক মহাসৃষ্টির প্রতিভা—একটি বিস্ফোরণ।” তবে নজরুলের কণ্ঠ ছিল আরও স্পষ্ট, আরও জোহী। রবীন্দ্রনাথ যেখানে “জীবনের ধারা শান্ত” করে ভেবেছেন, নজরুল সেখানে ঝড় তুলেছেন মানবিকতার পক্ষে। ব্রিটিশ বিরোধী কবিতায় নজরুল লিখেছেন—

“আনন্দময়ীর আগমনে, আনন্দে আজ হৃদয় বনো।”

তঁার বিপ্লবী কবিতাগুলোতে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথাই একত্রে এসেছে। আজ একুশ শতকে দাঁড়িয়েও নজরুলের অসাম্প্রদায়িকতা প্রাসঙ্গিক। আজ যখন ধর্মীয় বিভাজন রাজনৈতিক হাতিয়ার হয়ে উঠেছে, তখন নজরুলের বাণী শোনানো উচিত:

“আমি সেই গীত গাই- /যাহা মোরে ব্যাখ্যায় জাগায়, প্রেমে জাগায়, ঘৃণা করে বিভেদ সকল কুৎসিতের।”

তঁার কণ্ঠে যে সহমর্মিতা, আজকের পৃথিবী তা খুব বেশি প্রয়োজন। নজরুলকে শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকে আটকে রাখা অন্যায়। স্কুল-কলেজে নজরুলের অসাম্প্রদায়িকতা নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত। তঁার গজল, শ্যামাসঙ্গীত, প্রবন্ধ, কবিতা মানুষের মনের ভেদাভেদ হ্র করতে পারে। নজরুল মানেনই সেতু, নয় দেওয়াল নজরুল ইসলাম আমাদের শিখিয়েছেন, প্রেম করতে হলে আগে ঘৃণা ভুলতে হয়। ধর্মের আসল উদ্দেশ্য মানুষের মধ্যে সহানুভূতি গড়ে তোলা, বিভেদ সৃষ্টি নয়। এই ভাবনাই নজরুলকে বাংলা সাহিত্যে এক ব্যতিক্রমী আলো করে রেখেছে। তাঁকে যদি সত্যিই শ্রদ্ধা করতে চাই, তবে আমাদের প্রত্যেককে নিজের ভেতরে অসাম্প্রদায়িক নজরুলকে খুঁজে পেতে হবে—দয়া, প্রতিবাদ, সাম্য, এবং ভালোবাসার নজরুলকে।

“মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।”

এই বাক্যটিই নজরুলের চিরন্তন ধর্ম।

কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন শুভ দাস



শাক্তধর্ম মানে শক্তিবাদ। হিন্দুধর্মের প্রধান তিনটি বিভাগের অন্যতম এটি। হিন্দুধর্মের একটি শাখাসম্প্রদায় ছিল এই শাক্ত অনুসারীরা। হিন্দু দিবা মাতৃকা শক্তি বা দেবী পরম ও সর্বোচ্চ ঈশ্বর— এই মতবাদের ওপর ভিত্তি করেই শাক্তধর্মের উদ্ভব। আর এই

শাক্তদর্শন থেকেই নজরুলের শ্যামাসঙ্গীত রচনা শুরু।

হিন্দু পৌরাণিক কাহিনি মতে, দুর্গাদেবীর একটি বিশেষ রূপ হল ‘কালী’। এই কালীদেবীরই অন্য নাম আবার শ্যামা। শ্যামাবন্দনা বা শ্যামাদেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত গানগুলোকে সাধারণভাবে শ্যামাসঙ্গীত বলা হয়। শাক্তসঙ্গীত নামটিরও ব্যবহার হয় এক্ষেত্রে।

নজরুলের গানের একটা বিশাল অংশ জুড়ে যেমন রয়েছে ভজন এবং কীর্তন গান; তেমনি ব্যাপক অংশ জুড়ে রয়েছে শ্যামাসঙ্গীত। এত বিপুল পরিমাণ শ্যামাসঙ্গীত সমগ্র বঙ্গদেশে সম্ভবতঃ কাজী নজরুল ছাড়া আর কেউই লেখেননি। নজরুল ইসলামি ভাবধারার গানের থেকে অনেক অনেক বেশি তঁার শ্যামাসঙ্গীত। রামপ্রসাদ শ্যামাসঙ্গীত রচনার হ্রপাত করেন। নজরুল শ্যামাসঙ্গীতে কোথাও শ্যামা মাতৃরূপিণী, কোথাও কালীর রোজী রূপের ভয়ঙ্কর বর্ণনা, আবার কোথাও দেশাত্মবোধের প্রেরণা প্রকাশিত। অন্যান্য গানের চেয়ে নজরুলের শ্যামাসঙ্গীত সবচেয়ে সমৃদ্ধ এবং পরিমাণের প্রচুর বেশি। তঁার উল্লেখযোগ্য শ্যামাসঙ্গীত হচ্ছে— ‘বলরে জবা বল;’ ‘শ্যামা নামের লাগলো আগুন’,

‘আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায়’, ‘শ্মশানকালীর রূপ দেখে যা’; ‘শ্মশানে জাগিছে শ্যামা’, ‘খির হয়ে তুই বস দেখি মা;’ ‘ভারত শ্মশান হলো মা তুই;’ ‘আয় মা চঞ্চলা মুক্তকেশি শ্যামা কালী’; ‘শ্যামা তোর নাম যার জপমালা’; ‘ওমা খড়গ নিয়ে মাতিস রণে’। পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তিনি তার ব্যক্তি জীবনে কালি সাধনা ও করেছিলেন। ‘শ্যামা মা’র পরিচয় দিতে গিয়ে কবি লিখেছিলেন—

“আমার হাতে কালি মুখে কালি,

মা আমার কালিমাখা, মুখ দেখে মা পাড়ার লোকে হাসে খালি।

মোর লেখাপড়া হ’ল না মা, আমি ‘ম’ দেখিতেই দেখি শ্যামা,

আমি ‘ক’ দেখতেই কালী ব’লে নাচি দিয়ে করতালি।”

নজরুল ইসলাম যখন কালীপূজা করছেন, ভারতবর্ষের আবহাওয়া তখন ধর্মীয় আত্মপরিচয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। ধর্মীয় আত্মপরিচয়ের এই প্রবল ডামাডোলের মধ্যে নজরুল অংশগ্রহণ তো করলেনই না, বরং চলতে লাগলেন একেবারে উল্টোপথে। ১৯৪০ সালে নজরুল বরদা মজুমদারকে নিয়ে একপ্রকার গুরুবন্দনা করছেন। ওই বছর বরদাচরণের লেখা যোগ সাধনা বিষয়ক একটি বইয়ের ভূমিকা লিখতে গিয়ে তিনি অকপটে বলছেন যে, বরদাচরণ তঁার যোগ সাধনার গুরু এবং তঁার যাবতীয় অর্জনের প্রকৃত অনুপ্রেরণা।

ত্রিশের দশকের শেষ দিকে তিনি কালী সাধনা ও শ্যামা সংগীত রচনায় মগ্ন হয়ে থাকতেন। কবির শ্যামাসঙ্গীতগুলি শুনলেই বোঝা যায় যে, তিনি সাধনায় কতটা আত্মনিমগ্ন হয়েছিলেন।

“বল রে জবা বল বল, কোন সাধনায় পেলি শ্যামা মায়ের চরণতল? জবা কোন সাধনায় পেলি, মায়া তরুর বাঁধন টুটে, মায়ের পায়ের পড়লি লুটে মুক্তি পেলি, উঠলি ফুটে আনন্দ বিহুল।

তোর সাধনা আমায় শেখা।”

কবি মাকে দেখেছেন এমন এক অভিনব দৃষ্টিকোণ থেকে— মায়ের কাছে সন্তানের সব হুঃখ সুখে পরিণত হয়ে যায়। মাকে নিয়ে সকলের অপরিমিত ভালবাসা, আবেগ। কারও কলমের ভাষায় ব্যক্ত হয়, কারও মনে থাকে অব্যক্ত। কিন্তু একটি মাত্র বাক্যবন্ধে মা ধরা পড়েন পূর্ণভাবে— সব হুঃখ সুখ হয় মায়ের আশীষে। শুধু শ্যামাসংগীতই নয়, বিভিন্ন সাহিত্যকর্মেও তঁার কলমে ফুটে উঠেছে নারী বন্দনার কথা, কবি মন কখনও গোপনে কাঁদে মায়ের বঞ্চনায়, নারীত্বের অবমাননায়। নারী শুধু জোগান দিয়ে যায়, পুরুষের ক্ষুধা মেটায় নানাভাবে কিন্তু বঞ্চিত থেকে যায় তার অধিকার থেকে— সর্বসহা কন্যা মোর সর্বহারা মাতা/ শূন্য নাহি রহে কভু মাতা ও বিধাতা। নজরুল সাহিত্যে যে নারীর কথা বেশি চোখে পড়ে তিনি মানবী নন, তিনি আদ্যাশক্তি জগৎকারণ। মা কালীকে নিয়ে নজরুলের সাধনা ধর্মের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ছিল না। হ্রশো শ্যামাসঙ্গীত রচনা যিনি করতে পারেন তিনি তো সাধক ছাড়া আর কিছু নন, কালী নামে যেমন তিনি ভেসেছিলেন এবং সেই রচনা আজও এই একুশ শতকে প্রত্যেক বাঙালির ঘরে ঘরে বেজে উঠে সেই সুর কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন।

নজরুলের সাম্যবাদ ও বর্তমান সমাজ

স্পন্দন মুখোপাধ্যায়



কাজী নজরুল ইসলামের নামটির একটিই অর্থ আছে। আনন্দিত আর অপরিমিত যৌবন। প্রাণদীপ্ত যৌবন কোনো অনায়াস, কোনো মিথ্যা, কোনো বিষাদ, কোনো ভণ্ডামিকে সহ্য করে না—তাই তিনি স্বভাব বিদ্রোহী... — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

সমগ্র ভারতবর্ষ যখন ভেদ — বিভেদের দাবানলে গ্রস্ত, সে সময়ই মানবতার কান্ডারীর ন্যায় আবির্ভাব ঘটে কাজী নজরুল ইসলামের।

১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ তিনি কাজী ফকির আহমদ ও জাহেদা খাতুনের কোল আলো করে পদার্পণ করলেন দিকজুড়ি এই সমাজে। কবি নজরুলের শৈশবকাল অতিক্রান্ত হয়েছে অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে যার ফলে সমাজে ঘটে চলা নানা অমানবিক ঘটনাকে তিনি ছোট থেকেই চাক্ষুষ করে এসেছেন। এছাড়াও সেনাবাহিনীতে থাকার দরুণ তাকে দেশের নানা জায়গায় ভ্রমণ করতে হয়েছে, সেখানেও তিনি উপলব্ধি করেছেন কেবল মানুষের পতন...। ইংরেজদের সেই ‘Divide & Rule’ নীতির ভয়াবহ প্রতিফলন দেখা দিচ্ছিল সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে...। সমাজে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে লাগলো অসহিষ্ণুতা যার ফলে ক্রমশই দুর্বল হচ্ছিল স্বাধীনতা আন্দোলন। কাজী নজরুলও এই সবার বিরুদ্ধে লড়ার জন্য হাতে অস্ত্র তুলে নিলেন...। কলমাস্ত্র!। কখনও তিনি বিদ্রোহী আবার কখনও সাম্যবাদী। সমাজের ভাঙনকে রুখতে তিনি তাঁর রচনার মাধ্যমে ছড়িয়ে যেতে লাগলেন সম্প্রীতির আলো। সকলে যেন জাতি, ধর্ম বা শ্রেণি-ভেদ ভুলে একসাথে ভালোবাসা ও সহানুভূতির বন্ধনে আবদ্ধ হয় –

“গাহি সাম্যের গান–

যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান

যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রীষ্টান...”

কাজী নজরুল ইসলামের লেখায় সর্বদা মানবতার গভীর বার্তা ফুটে উঠেছে। তিনি চেয়েছিলেন, মানুষ যেন ধর্ম, জাতি বা সম্প্রদায়ের ভেদাভেদ ভুলে একসাথে মিলেমিশে শান্তি ও সৌহার্দ্যের সঙ্গে বসবাস করতে পারে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন, “কবি নজরুল যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেটা শুধু তাঁর নিজের স্বপ্ন নয় – সমগ্র বাঙালি জাতির স্বপ্ন...”। কিন্তু বাস্তবে সেই স্বপ্ন আজও পূর্ণতা পায়নি। সমাজে এখনও বিভাজন, অসহিষ্ণুতা ও বিদ্বেষের ছায়া বিরাজ করছে। তাই আমাদের উচিত নজরুলের সেই মহান স্বপ্নকে জীবন্ত করে তোলা, যাতে আমরা মানবিকতা, সহনশীলতা ও ঐক্যের পথে এগিয়ে যেতে পারি। সাম্যকবির কাব্যবিদ্রোহ যে ছই দেশের সাথে জড়িয়ে ছিল বর্তমান সময়ে উভয় দেশেই ধর্মকেন্দ্রিক বিবাদ ক্রমশ বর্ধমান। আজ যেখানে আমরা প্রগতির শিখর ছুঁতে ছিলাম সেখানে আমরা পড়ে আছি, “কার ধর্ম কতটা শ্রেষ্ঠ” এই তর্কে। আমরা ‘মানুষ’। আমাদের ধর্ম ‘মানবিকতা’ কিন্তু আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমাদের অভিধানে এই শব্দ আদৌ আছে কি না এতে প্রবল সংশয় রয়েছে। নজরুল এত বছর পূর্বে যা লিখেছিলেন তার প্রয়োজন আজকের সমাজে অতি আবশ্যিক, “এসো ভাই হিন্দু! এসো মুসলমান! এসো বৌদ্ধ! এসো খ্রিস্টিয়ান! আজ আমরা সব গণ্ডি কাটাইয়া, সব সংকীর্ণতা, সব মিথ্যা, সব স্বার্থ চিরতরে পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি। আজ আমরা আর কলহ করিব না। চাহিয়া দেখো, পাশে তোমাদের মহা শয়নে শায়িত ওই বীর ভ্রাতৃগণের শব। ওই গোরস্থান-ওই শ্মশানভূমিতে-শোনো শোনো তাহাদের তরুণ আত্মার অতৃপ্ত ক্রন্দন। এ পবিত্র স্থানে স্বার্থের দ্বন্দ্ব মিটাইয়া দাও ভাই।” (নবযুগ)

দেশে দেশে চলা কিছু উগ্র রাজনৈতিক লালসা আজকের দিনের ধর্মবিবাদের এক মহৎ কারণ বললেও বোধ করি ভুল হবে না। কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা সাধারণ মানুষদের ধর্মের ভিত্তিতে ভিড়িয়ে নিজ লাভ নিশ্চিত করতে উদ্যত। ধর্মের বাস মানুষের অন্তরে। ধর্মব্যবসায়ী যারা তারা এই ধর্মকে ব্যবসার মতো হাতিয়ার করে সমস্ত সমাজে এক অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। এতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে সমাজের দরিদ্রকুলের মানুষেরা। এসবকে প্রতিহত করার গুরুদায়িত্ব আর কারও নয় সমাজপ্রেমীদেরই। ধর্ম বর্ণ নিবিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়ে যেতে হবে সমাজ বিরোধীদের সঙ্গে।

নজরুল লিখে গেছেন,

“মরিছে হিন্দু, মরে মুসলিম এ উহার ঘায়ে আজ,
বুঁচে আছে যারা মরিতেছে তারা, এ মরণে নাহি লাজ।
জেগেছে শক্তি, তাই হানাহানি,
অস্ত্রে অস্ত্রে নব জানাজানি।” (হিন্দু মুসলিম যুদ্ধ)

সমাজের মধ্যে যখন অন্যায় অনাচার বৃদ্ধি পায় তখনই পথে নামতে হয় ‘মানুষদের’। কিন্তু এখানেও ‘কিন্তু’ রয়েছে, ইংরেজ শাসনামলই হোক কিংবা আজকের সময়ই হোক, মানুষজাতির একটা বড় অংশ তাদের ‘মানুষ’ হওয়ার সংজ্ঞাকে অবজ্ঞা করে চিরকালই নিশ্চুপ হয়ে ছিল। কাজী নজরুল সর্বদাই চেষ্টা করে গেছেন আমাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে উদ্বুদ্ধ করতে। ‘মানুষ’ হয়ে যখন জন্মেছি তখন ‘মান’ এবং ‘হুশ’ উভয়ই থাকতে হবে আমাদের মধ্যে। তিনি ঘুমন্ত সমাজকে জাগিয়ে তুলতে লিখে গেছেন অজস্র কবিতা। অগ্র-পশ্চিম কবিতায় তিনি বলেছেন,

“প্রাণ-চঞ্চল প্রাচী-র তরুণ, কর্মবীর,
হে মানবতার প্রতীক গর্ব উচ্চশির!
দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, তোরা দৃপ্তপদ
সকলের আগে চলিবি পারায়ে গিরি ও নদ,
মরু-সঞ্চর গতি-চপল।”

মানুষে মানুষে ভেদাভেদ থাকা অনুচিত এবং নিজ স্বার্থ ত্যাগ করে মানব মন্ত্রের জয়গান করতে হবে, কেননা এতেই মোক্ষ লাভ সম্ভব। – কাজী নজরুল ইসলাম এই মতেরই চিরপ্রবর্তক ছিলেন। নানা মত, বিশ্বাসে বিভক্ত এই সমাজকে তিনি দিয়ে এসেছেন সৌভ্রাতৃত্বের অমূল্য বাণী। বিভক্ত সমাজ অর্থাৎ দুর্বল সমাজ। তিনি প্রশ্ন করেছেন যে ঈশ্বর আমাদের তৈরিতে কোনো ভেদাভেদ রাখেননি তাঁর সন্তান হয়ে আমরা কেন এই সব ধর্ম নিয়ে হানাহানিতে লিপ্ত? নজরুল কখনই এই প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে মেনে নিতে পারেননি। আজকাল আমরা সবাই নিজেদের ‘Modern’ ঘোষিত করে অত্যন্ত আগ্রহ হই! কিন্তু এই সমাজই সবচাইতে গোঁড়া কিংবা ‘বিভেদগ্রস্ত’! কেন? উচ্চ, নীচ, দান, বাম কে এইসবের নির্ণয়কর্তা? খোদ এই সমাজই! তাই আমরা দেখে থাকি যাদের আমরা সাধারণত নীচ বলে দাবি করি তারাই মূলত সমাজটাকে ধরে রেখেছে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারাই সর্বাধিক শোষিত হোন। অপরদিকে নজরুল কিন্তু নিজেকে কখনও ‘Modern’ বলে দাবি করেননি। কিন্তু তাঁর চিন্তাধারা ‘Modern’ কি ‘Ancient’ তা আপনি নিজেই নির্ণয় করতে পারবেন। তাঁর ‘কুলি মজুর’ কবিতায় আমরা পাই,

“দেখিনু সেদিন রеле,
কুলি ব’লে এক বাবু সা’ব তারে ঠেলে দিলে নীচে ফেলে!
চোখ ফেটে এল জল,
এমনি ক’রে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল?”

ধর্মীয় উগ্রতা সমাজে বিভেদ, হিংসা ও সংঘাতের জন্ম দেয়। একে কেন্দ্র করে মানুষে মানুষে শত্রুতা বাড়ে, মানবিক মূল্যবোধ ও সহনশীলতা হারিয়ে যায়। কাজী নজরুল ইসলাম এই ধর্মীয় উগ্রতার বিরুদ্ধে ছিলেন অত্যন্ত সোচ্চার। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও আভিজাত্যবোধের কারণে সমাজে বারবার বিভাজন ও অগ্রগতির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর মতে, ধর্মের মূল উদ্দেশ্য মানুষের কল্যাণ, অথচ ধর্মীয় উগ্রতা সেই কল্যাণকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলে। তাঁর বক্তব্য,

“কোথায় তুই খুঁজিস ভগবান, সে যে রে তোরই মাঝে রয়,
চেয়ে দেখ সে তোরই মাঝে রয়।
সাজিয়া যোগী ও দরবেশ খুঁজিস ঘায় পাহাড় জঙ্গলময়।।

আঁখি খোল্ ইচ্ছা-অন্ধের দল নিজেদের দেখে রে আয়নাতে,
দেখিবি তোরই এই দেহে নিরাকার তাঁহার পরিচয়।।
ভাবিস্ তুই ক্ষুদ্র কলেবর, ইহাতেই অসীম নীলাম্বর,
এ দেহের আধারে গোপন রয়ে সে বিশ্ব-চরাচর।
প্রাণে তোর প্রাণের ঠাকুর বেহেশতে স্বর্গে কোথাও নয়।।
এই তোর মন্দির-মসজিদ এই তোর কাশী-বৃন্দাবন,
আপনার পানে ফিরে চল কোথা তুই তীর্থে যাবি, মন!
এই তোর মক্কা-মদিনা, জগন্নাথ-ক্ষেত্র এই হৃদয়।”

এছাড়াও নজরুল ধর্মীয় গৌড়ামির ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়েছিলেন। নজরুল কখনই এই প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে মেনে নিতে পারেননি। তাঁর দেখানো পথকে যদি আমরা কানাকড়িও অনুসরণ করতে পারতাম, হয়তো আজ এই সকল গৌড়ামি থেকে মুক্তি পেত আজকের বঙ্গকুল। তিনি কি নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন,

“সঙ্গীর্গতা ক্ষুদ্রতা ভোলো

সকল মানুষে উর্ধে ধরিয়া তোলা।।” (জাগরণী)

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অমর কথা, “যত মত, তত পথ” আমাদের সবার বহুবার স্মৃতিগোচর হয়েছে যদিও আজকের এই ‘স্বঘোষিত আধুনিক’ যুগেও এর প্রতিফলন বিরল। কাজী নজরুল এই পন্থাকেই চিরকাল অনুসরণ করে এসেছেন। তিনি সত্য ও সৌন্দর্যের মহিমা গাইতে ভালোবাসতেন এবং সব সময় চাইতেন ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভাবনা যেন পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহর কাছে তাই তিনি চেয়েছেন,

“ইযা আল্লাহ, তুমি রক্ষা কর দুনিয়া ও দ্বীন।

শান-শওকতে হোক পূর্ণ আবার নিখিল মুসলেমিন”।

একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান হয়েও তিনি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পূজ্য মা কালী ও শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত ছিলেন। কলকাতায় থাকাকালীন তিনি তাঁর স্থাশুড়ি গিরিবালা দেবীর ঠাকুরঘরে দীর্ঘ সময় ধ্যানাচ্ছন থাকতেন এমনকি তিনি দেবী ফুল্লার পিঠেও সাধনা করেছেন এমন কথাও শোনা যায়। কাজী নজরুল মা কালীর প্রতি এক গভীর ঐশ্বরিক আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন, যার ফলে তিনি প্রায় ২৫০টির মতন শ্যামা সঙ্গীত রচনা করেছেন। তাঁর শ্যামা সঙ্গীত গুলোতে কখনও কালী পূজিত হয়েছেন মা রূপে কখনও আবার মেয়ে রূপে। তাঁর অসংখ্য শ্যামা সঙ্গীতের মধ্যে একটি হলো,

“আমার শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে/জপি আমি শ্যামের নাম,
ওগো, মা হলেন মোর মন্ত্রগুরু/ আমার ঠাকুর হলেন
রাধাশ্যাম”

আজকের যুগে কাজী নজরুল ইসলামের প্রাসঙ্গিকতা ঠিক কতটা? কবি নজরুল ছিলেন অসাম্প্রদায়িকতার একজন অমোঘ কান্ডারী। তিনি তাঁর রচনায় সদাই গেয়ে এসেছেন মনুষ্যত্বের জয়গান। মানুষ হয়ে আমরা জন্ম নিয়েছি, মানবতাই আমাদের প্রকৃত ধর্ম। কিন্তু আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমাদের সমাজ প্রকৃতপক্ষে ঠিক কতটা ধর্মনিরপেক্ষ হতে পেরেছে? যারা এখন নিজেদের সাম্যবাদী বলে গলা চড়ান তারা কেবলই নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে এই সকল বুলি আওড়াচ্ছেন। আজকের এই অশান্ত, নীতিহীন সমাজে নজরুল চর্চার প্রয়োজন অতি আবশ্যিক। দিশাহীন এই সমাজকে সঠিক পথে আনতে আমাদের নজরুল ইসলামের কথাগুলোকে অনুসরণ করার প্রয়োজন অত্যধিক। ছদ্মবেশী ধর্মনিরপেক্ষতা যাতে সমাজকে গ্রাস না করতে পারে তার বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়াতে হবে আমাদেরই। সব ধর্মকে সম্মান করার দায়িত্ব যেরকম আমাদের তেমনি মানবতার ভার বহন করার দায়িত্বও আমাদের।

“মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান!”

নজরুলের সঙ্গীতে শ্যামাসঙ্গীত ও বৈষ্ণবীয় ধারার প্রভাব
সুরভী সাহা



বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরেই যদি
বাঙালি কারো নাম নেয়, তিনি হলেন কাজী
নজরুল ইসলাম। বর্ধমান জেলায়

আসানসোল মহকুমার জামুরিয়া থানার অন্তর্গত
চুর্লিয়া গ্রামে বাংলা ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ ২৪শে মে ১৮৯৯
খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম। পিতা কাজী ফকির আহমেদ মাতা জাহেদা খাতুন।
নজরুলের মাত্র ৮ বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ ঘটে। তারপর তাদের
দারিদ্রতা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। এই দারিদ্রতার জন্যই নজরুল
ভালোভাবে পড়াশোনা করতে পারেননি। তবে তিনি বাল্যকাল
থেকেই মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি তার গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন
প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরবর্তীতে ময়মনসিংহের দরিয়া হাই
স্কুলের সপ্তম থেকে দশম শ্রেণি প্রি-টেন্স পর্যন্ত পড়াশোনা করেন।
বিদ্রোহী কবি হিসেবে নজরুলের খ্যাতি দিগন্ত বিস্তৃত হলেও সংগীত
প্রতিবার জন্য জনমানবে তিনি একটি স্থায়ী আসন তৈরি করে
নিয়েছিলেন। এ কথা অনস্বীকার্য যে নজরুলের প্রতিভার স্ফুটি
সবথেকে বেশি হয়েছে সংগীতে তারপর কাব্যে। ভক্তিমূলক, আধ্যাত্মিক,
বৈষ্ণব পদাবলী, কীর্তন, জারি, সারি, ইসলামিক, গজল, ভাটিয়ালি,
প্রেমমূলক, ক্লাসিক্যাল, সেমি ক্লাসিক্যাল প্রভৃতি সংগীতের বিভিন্ন
শাখায় অবাধভাবে বিচরণ করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর সঙ্গীত
জগতের পারদর্শিতা মুগ্ধ করেছে সকলকে।

বাংলাদেশ তথা সাহিত্যে সাধক রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের পরই শক্তি
তত্ত্বের ভাষ্যকার উত্তরাধিকার বলা যায় নজরুল ইসলামকে। নজরুলে
লেখায় ব্যাপক অংশ জুড়ে রয়েছে শ্যামা সংগীত। এত বিপুল পরিমাণ
শ্যামা সংগীত সমগ্র বাংলাদেশে তিনি ছাড়া আর কারও রচনায় খুঁজে
পাওয়া হুসুর। নজরুলের শ্যামাসঙ্গীতে কোথাও শ্যামা মাতৃরূপিণী
কোথাও রোদ্রীকূপিণী ভয়ংকরী। এই শ্যামা সঙ্গীতের আসল রস হচ্ছে
বাৎসল্য রস, যা নজরুল তার রচনায় যথার্থ বর্ণনা করেছেন। বিংশ
শতাব্দীর প্রাঙ্গণে এক নতুন ধারায় শান্ত সংগীত রচনা করেন নজরুল
ইসলাম। দেবী কালীকে নজরুল আত্মসচেতন, নিরহংকারিনী, শুভচিন্তার
উদ্রেককারিণী, অশুভনাশিনী, আমিত্ববিনাশিনী প্রভৃতি গুণধারিনী
হিসেবে দেখিয়েছেন। নজরুল দেবী কালীর কালো রূপকে এতো হৃদয়
ভাবে আলোর মহিমায় মহিমায়িত করেছেন যে তা আমাদের মনকে
আকর্ষিত করতে বাধ্য

“কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন”

এই গানে দেবিকারের দীপঙ্করের রূপটি তুলেছেন এভাবে

“সিন্ধুতে মার বিলু খানিক ঠিকরে পড়ে রূপের মানিক

বিশ্বে মায়ের রূপ ধরে না মা আমার তাই দিগবসন।”

নজরুল ইসলামের লেখায় রয়েছে উচ্চ স্তরীয় সাধকের ন্যায় চিন্তন। তা
না হলে এরকম রূপ চিন্তন ও বর্ণন সাধারণ মানুষ কখনোই ভাবতে
পারেনা। আগমনী পর্যায়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য গান-

“মাগো চিন্ময়ী রূপ ধরে আয়

মৃন্ময়ী রূপ তোর পূজা শ্রী হুর্গা তাই

হুর্গতি কাটিলো না হায়”

এছাড়াও

“এবার নবীন মস্তে হবে জননী তোর উদ্বোধন

নিত্যা হয়ে রইবি ঘরে হবে না তোর বিসর্জন”

তিনি উমার বিসর্জনের করুন সুরটি তুলে ধরেন এভাবে -

“যাস্ নে মা ফিরে যাস্ নে জননী ধরি ছুটি রাঙ্গা পায়

শরণাগত দীন সন্তানে ফেলে রাখি ধরার ধূলায়”
তিনি লিখেছেন শ্যামা মা শ্মশানে বসে আছে মরণের ছেলে সন্তানকে
কোলে নিতে,

“শ্মশানে জাগিছে শ্যামা, /অন্তিমে সন্তানের নিতে কোলে
জননী শান্তিময়ী বসিয়া আছে ওই
চিতার আগুন ঢেকে মেহের আঁচলে”

কখনো আবার শ্যামা কে তিনি মেয়ে রূপে বর্ণনা করছেন-

“আমার শ্যামা বড় লাজুক মেয়ে”

অথবা

“খীর হয়ে তুই বস দেখি মা/থানিক আমার আখির আগে”

ও মেয়ে নাকি আবার রাগও করে-

“আমার কালো মেয়ে রাগ করেছে কে দিয়েছে গালি”

নজরুল ইসলামের দশমহাবিদ্যা নিয়েও হৃন্দর একটি গান রচনা করেন-

“কে জানে মা তব মায়া, /মহামায়া রূপিণী
বিরাজো সর্বত্র তুমি মা বিশ্বব্যাপীণী।”

নজরুল ইসলামের শ্যামা সংগীত জনপ্রিয় হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ
ছিল আবেগের গভীরতা শ্যামা সঙ্গীতের অবদান সম্পর্কে ডঃ করুণাময়
গোস্বামী লেখেন:

“শ্যামাসঙ্গীতে রচয়িতা রূপে, রামপ্রসাদ সেন বা কমলাকান্ত ভট্টাচার্য
সাস্পীতিক নান্দনিকতায় যে স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন নজরুল তদাপেক্ষা
উচ্চস্তরে পৌঁছেছিলেন। কেননা কবি ও স্রষ্টা রূপে তিনি পূর্ববর্তী
সংগীত রচয়িতাদের চেয়ে মহৎ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। সে পরিচয়
তিনি অত্যন্ত গভীরভাবে রেখেছেন তার গানে।”

তার কিছু বিখ্যাত শ্যামা সংগীত

- ১) বলেরে জবা বল ২) কালো মেয়ের পায়ের তলায়
- ৩) কে পরালো মুন্ডমালা
- ৪) মহাকালের কোলে এসে গৌরী হলো মহাকালী
- ৫) ও মা দনুজদলনী মহাশক্তি ৬) এলোরে শ্রী হুগা
- ৭) শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে জপি আমি শ্যামের নাম
- ৮) মহাবিদ্যা আদ্যাশক্তি পরমেশ্বরী কালিকা, প্রভৃতি।

নজরুলের গানের এক বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে ভজন। বৈষ্ণব
পদাবলী বলতে যা বোঝায় রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক। এই বৈষ্ণব পদাবলীর
ধারায় পদাবলী কীর্তন ঢেউ নজরুল প্রচুর কীর্তন রচনা করেছেন। কথা ও
সুর পুরোপুরি কীর্তন। কিছু গান ভজন, কিছু কীর্তন রয়েছে। পদাবলী
কীর্তন বা কীর্তন গান বাঙালির বহু কালের ঐতিহ্যের ধারক। নজরুলের
কীর্তন খুবই স্বন্দ। কথা ও সুরের অসাধারণ সমন্বয়ে ঘটিয়েছেন তিনি।
আধুনিকালে যারা কীর্তন রচনা করেছেন তাদের মধ্যে নজরুল অন্যতম
শ্রেষ্ঠ। নজরুলের পুত্র অনিরুদ্ধ তাঁর ‘নজরুলগীতি’ প্রবন্ধে লিখেছেন:

“বৈষ্ণব যারা তারা রাধা কৃষ্ণের বাল্যলীলা, প্রেমলীলা ও গোষ্ঠলীলার
সুর্চিত দর্শনের হ্রলভ সুযোগ লাভ করবেন নজরুলের রচনায়।”

নজরুল ইসলাম কিছুটা হলেও বৈষ্ণব পদাবলী দ্বারা প্রভাবিত
হয়েছিলেন কারণ বৈষ্ণব পদাবলীর মূল কয়েকটি রসের কিছুটা প্রভাব
তার লেখনীতে স্পষ্ট। শ্রী রাধিকার হৃৎথে কবির মন ব্যথিত তার
শ্রীরাধিকার শ্যামকে উদ্দেশ্য করে বলছে:-

“তুমি যদি রাধা হতে শ্যাম

আমারই মতন দিবস নিশী জপিতে রাধা নাম”

গোবিন্দ দাস, জ্ঞানদাস, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রমুখ ব্যক্তিত্বের পরে
বাংলায় কীর্তনে অন্যতম জায়গা করে নিয়ে নজরুল ইসলাম। ইসলাম
ধর্মাবলম্বী হয়েও রাধা কৃষ্ণের সেই দিব্য প্রেমলীলা অভিনবভাবে বর্ণনা
করেছেন তা সত্যিই চিত্তাকর্ষক।

নজরুল ইসলাম মানভঞ্জন পর্যায়ে লিখেছেন:

“সখি আমি না হয় মান করেছি/তোরা তো সকলে ছিলি,
চলে গেল হরি তোরা পায়ে ধরি/ কেন নাহি ফিরাইলি”

এত হৃন্দর মান অভিমান নিয়ে লিখা মানভঞ্জন এর সেই অপূর্ব দৃশ্য
কাব্যের মাধ্যমে তুলে ধরা, যে কোন সাধারণ মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়।
হোরী পর্যায়ে নজরুল ইসলাম লিখেছেন :-

“আজি মনে মনে লাগে হোরী”

এছাড়া, “আজ গোপী খেলে হোরি”।

নজরুল শ্রী রাধিকা ও তুলসীর যে কৃষ্ণকে পাওয়ার বাসনা বর্ণনা
করেছেন এভাবে, “রাধা তুলসী প্রেম বাঁশি কৃষ্ণ নারায়ণ।”

জন্মাষ্টমী পর্যায়ে নজরুলের উল্লেখযোগ্য গান

“তিমিরও বিদায়ী অলখ বিহারী /কৃষ্ণ মুরারি আগত ওই”

অথবা

“ফিরে এলো সেই কৃষ্ণাষ্টমী”।

তার ভাব সম্মেলন বিষয়ক কিছু গান:

- ১) বধু আমি ছিঁই বুঝি বৃন্দাবনে রাধিকার আঁখি জলে
- ২) আমি কুল ছেড়ে চলিলাম
- ৩) ও তুই যাসনি রাই কিশোরী কদমতলাতে
- ৪) হুখী সাজায়ে রাখলো পুষ্পবাসর
- ৫) শুনল বাঁশিতে ডাকে আমারে শ্যাম

এছাড়াও নজরুল ইসলামের কিছু বিখ্যাত কীর্তন ভজন:

- ১) গোঠে রাখাল বলে দেরে কোথায় বৃন্দাবন
- ২) হে গোবিন্দ রাখে চরণে ৩) খেলিছ এ বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু
- ৪) আনন্দঘন শ্যাম ৫) কৃষ্ণ গোপাল শ্রী কৃষ্ণ গোপাল
- ৬) ওরে নীল যমুনার জল ৭) গগনে কৃষ্ণ মেঘ দোলে
- ৮) আজি নন্দচলার সাথে প্রভৃতি।

নজরুল ইসলাম ছিলেন একটি বহুমাত্রিক সাহিত্যস্রষ্টা। নজরুল
ইসলামের সাহিত্য তথা সৃষ্টিকর্ম কেবল একটি ধর্ম মানুষের মধ্যে
সীমাবদ্ধ নয় তিনি নদীর ন্যায় নিজের জ্ঞানশাখাকে বিস্তৃত করেছেন
বিভিন্ন শাখায়। তার রচনায় শান্ত প্রভাবে এসেছে আত্মশক্তি নারীর
অধিকার, শ্যামা মায়ের প্রতি বাৎসল্য প্রেম, মায়ের রূপমাধুরীর বর্ণনা,
কখনো নারীর প্রতিবাদিতা এবং বৈষ্ণব প্রভাবে এসেছে প্রেম ভক্তি
করনা ও মানব রূপ ঈশ্বরের সন্ধান। জাত পাত তথা ধর্মের উর্ধ্বে উঠে
তার রচনা এই ছই এর প্রভাবে যুগলবন্দী নজরুলকে বাংলা সাহিত্যের
এক অনন্য মানবতাবাদী রূপ দিয়েছে।

সংগীত সম্প্রীতির আঙিনায় নজরুল ইসলাম

অলকা চক্রবর্তী



বাংলা সাহিত্যে বিংশ শতাব্দীতে সাম্যবাদী চিন্তা
চেতনা নিয়ে যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছেন

তিনি হলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

১৮৯৯ সালের ২৪মে বর্ধমানের চুরুলিয়া গ্রামে
নজরুলের জন্ম হয়। ছোটবেলায় তিনি চুরুলিয়া গ্রামের

মসজিদের খাদেম ছিলেন, সেখানে তিনি ইমামতি করেছেন। এই
ধর্মনিষ্ঠা ভাব তাঁর জীবনকে সংগীতের প্রতি প্রভাবিত করেছিল। পিতার
কাছ থেকেও পেয়েছেন উদারতা ও সহনশীলতার ধর্ম। তিনি
অপমানিত, লাঞ্চিত মানুষের বন্ধু হয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন
সবসময়। তাঁর কাছে মানবতাবোধ ছিল সর্বাপেক্ষা বড়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ
নির্বিশেষে নোংরা রাজনীতির অনেক উর্ধ্বে ছিল তাঁর আসন। তাই তিনি
কবিতার সাথে সাথে গান রচনা করা শুরু করেন। এই গানের মাধ্যমেই
তিনি সেই পীড়িত মানুষের মনের আতি সকলের সামনে প্রকাশ করেন

এবং যারা শোষিত শ্রেণির প্রতিনিধি তাদের চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেন তারা সেই দরিদ্র অসহায় মানুষদের উপর নির্যাতন করে চলেছে দিনের পর দিন। মানব দরদী হিসাবে খ্যাত ছিলেন তিনি। বাংলা সাহিত্যে এমন ক'জন কবি আছেন যারা মানব প্রেমের কথা ব্যক্ত করেছেন? কিন্তু নজরুল ইসলাম হলেন সেই ব্যক্তি, যার লেখনীতে প্রকাশ পেয়েছে অবহেলিত মানুষদের অসহায়তার কথা। তিনি উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র সবাইকেই বলেছেন এক হতে। তাঁর মতে হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিষ্টান বৌদ্ধ জৈন সবাইকেই নিজেদের জাত পাত ভুলে একাত্ম হওয়ার জন্য বলেছেন। তাঁর মতে একতাই সব। তাই তিনি জাতিধর্ম নিবিশেষে সবাইকে সাম্যের জয়গান করতে বলেছেন-

“গাহি সাম্যের গান যেখানে

আসিয়া এক হয়ে গেছে সব ব্যবধান

যেখানে মিশেছে হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান খ্রিষ্টান।”

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম সাহিত্যিক ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুল ইসলাম সর্বদাই ধর্ম ও বর্ণ সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে ছিলেন এবং মনুষ্যত্বের জয়গান গেয়েছেন। বিশ্বজুড়ে যখন জাতিভেদ নিয়ে রণছন্দ ভি বাজছিল, অন্যদিকে নজরুল ইসলাম একদিকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, অন্যদিকে কালী কীর্তন গাইছেন। কালী বিষয়ক অনেক গান তিনি রচনা করেছেন। তিনি শুধু হিন্দুত্ববাদী সংগীত রচনা করেছেন তা নয়, অনেক ইসলামী গান রচনা করেও মুসলমানদের প্রাণের দেবতা হয়ে উঠেছেন। হিন্দু ও মুসলমানদের মিলনের জন্য তিনি লিখেছেন---

“মোরা এক বৃন্তে ছুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান

মুসলিম তার নয়ন মণি, হিন্দু তার প্রাণ

এক সে আকাশ মায়ের কোলে

যেন রবি শশী দোলে

এক রক্ত বৃকের তলে এক সে নারীর টান।”

কাজী নজরুল ইসলামের প্রকাশিত গানের সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন হাজার। তাছাড়া প্রচুর অপ্রকাশিত গানও রয়েছে। কবি নজরুল ইসলামের গানে মূলত লক্ষ্য করা যায়, সেগুলি দেশাত্মবোধক, উদ্দীপক ও ভক্তিমূলক সংগীত। তিনি যেমন হিন্দুত্বের জন্য গান-কবিতা রচনা করেছেন, তেমনি ইসলামিক গান রচনা করেছেন। একই স্রোতায় বেঁধে নিয়ে চলার অন্যতম প্রধান মন্ত্র হলো তাঁর সাম্যবাদী চিন্তা-চেতনা। এই চেতনাই তাঁকে বহু কবি হিসেবে গড়ে তোলে। তিনি কোনো কৃত্রিম ধর্মে বিশ্বাসী নন।

‘সবার উপরে মানুষ সত্য’ এই নীতির আদর্শে তাঁর ব্যক্তি জীবন যেমনভাবে গতি পেয়েছে, ঠিক তেমনি সাহিত্য-সংগীত জীবনও গতিশীল হয়েছে। তাই তিনি গানে বলেছেন---

“জানিস নাকি ধর্ম সেজে বর্ম সম সহনশীল

তাকে কি ভাই ভাঙতে পারে ছোঁয়াছুঁয়ের ছোট চিলা।”

তাঁর সংগীত সৃষ্টিকে শুধুমাত্র একদিক দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করা যায় না। তাঁর অনেকগুলো সৃষ্টির মধ্যে অন্যতম হলো ভক্তিগীতি ও শ্যামাসঙ্গীতের বিশাল ভাণ্ডার। তাঁর রচিত ভক্তিগীতির মধ্যে ইসলাম ও হিন্দু ভক্তিগীতি উভয়ই রয়েছে, তবে হিন্দু ভক্তিগীতি অধিকসংখ্যক-প্রায় ৫২৫টি। এর মধ্যে রয়েছে ভজন, শ্যামা সংগীত, আগমনী, কীর্তন, শিব, চণ্ডী, নারায়ণ, লক্ষ্মী, সরস্বতী বিষয়ক নানা ধরনের গান। তাছাড়া শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা জানিয়েও কবি রচনা করেছেন অনবদ্য সংগীত। তিনি এসব গান বিক্ষিপ্তভাবে ১৯২৯ থেকে ১৯৩০ সালের দিকে শুরু করেন। নজরুলের ভক্তিমূলক গানে মূলত মানবপ্রেমই ছিল মূল সুর। কাজী নজরুল ইসলাম যে স্বার্থ-সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন, তার প্রমাণ মেলে শ্যামাসঙ্গীতে। তিনি একজন ইসলামিক কবি হওয়া সত্ত্বেও শ্যামাসঙ্গীতকে ভিতর থেকে অনুভব

করেছেন এবং অন্তরের ভালোবাসা দিয়ে মা কালীকে ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখেছেন। তাই তিনি শ্যামাসঙ্গীতে বলেছেন--

‘মাতৃ নামের হোমের শিক্ষা আমার বুক কে জ্বালানো?’

নজরুল শুধু শ্যামাকে মা রূপে পেতে চাননি, তিনি তাঁকে নিজের মেয়ের মতো করেও পেতে চেয়েছেন। আদর করে মেয়েকে ভিন্ন নামে ডাকেন। তিনি বলেন, কালো আছে বলেই জগত আলোময়। শ্যামাসঙ্গীতে নজরুলের অবদান অনেক। তাঁর অন্যতম শ্যামাসঙ্গীতের একটি গান হল--

“আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায়

দেখে যা আলোর নাচন-

মায়ের রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব যার হাতে মরণ বাঁচন

‘বলরে জবা বল কোন সাধনায় পেলি শ্যামা মায়ের চরণতল?’

কাজী নজরুল ইসলামের গানের প্রসঙ্গ আলোচনার আরেকটি দিক হলো ‘আগমনী’ সংগীত। হর্গাপূজায় দেবী পূজিত হন সপরিবারে। সবাইয়ের বলে হর্গতি বিনাশ করেন বলেই তাঁর নাম হর্গা। সেই হর্গা বা আনন্দময়ীকে নিয়ে ইসলামিক কবি মেতে ওঠেন এবং অনেক গান রচনা করেন। প্রায় শত বছর আগে, ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর নিজের সম্পাদিত অর্ধ-সাপ্তাহিক ‘ধুমকেতু’ পত্রিকায় হর্গাপূজা সংখ্যায় লেখেন ‘আনন্দময়ী আগমনের’ কবিতা। তিনি দেবী হর্গাকে রুদ্রমূর্তি ধারণ করে রণক্ষেত্রে এসে ভারতবাসীকে জাগ্রত ও শোষকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আহ্বান জানান। কবি বলেছেন--

“আর কতকাল থাকবি বেটি মাটির ঢেলার মূর্তি-আড়াল?

স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।”

এই মৃত্যুপুরীতেও দেবীর পূজো হয়, চণ্ডীপাঠ হয়। বিশেষত চণ্ডীপাঠ ব্যতীত হর্গাপূজা অকল্পনীয়। আর তাই তো চণ্ডীর কাহিনিও বাদ যায় না তাঁর কবিতা থেকে। তবে সেই চণ্ডীর কাহিনি-ইতিহাসের রূপান্তর ঘটে কবি-কল্পনায়। সত্য-ত্রুতা যুগের কাহিনির সঙ্গে সমকালীন বীরত্ব-গৌরবের ইতিহাস একাকার হয়ে উঠে আসে কবিতায়-

‘মহিষাসুর বধ করে তুই ভেবেছিলি রইবে স্থখে,

পারিলি তা ত্রেতা যুগে, টলল আসন রামের হুখে।

আর এলিনে রুদ্রাণী তুই, জানিনে কেউ ডাকল কি না।”

তাছাড়া কাজী নজরুল ইসলাম দেশভক্তিমূলক গানও রচনা করেছেন। এছাড়াও অনেক গজল, শ্যামাসঙ্গীত, বিভিন্ন গান তিনি রচনা করেছেন। বিভিন্ন অনুভূতি দিয়ে তিনি গান সৃষ্টি করেছেন, তাঁর অন্তরের অন্তস্থল থেকে গানের এক একটি লাইন তিনি সৃষ্টি করে গেছেন। তার মধ্যে আরেকটি হলো তাঁর দেশভক্তিমূলক গান। এটি তিনি বিদ্রোহী কবি হিসেবে রচনা করেছেন। তিনি জনজাতিকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন গানের মাধ্যমে। দেশভক্তি ও জাতীয়তাবাদের অনুপ্রেরণায় বীর সন্তানদের সাহস প্রদানের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজানোর আবেদন জানিয়েছেন--

‘হে পার্থ সারথি বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য শঙ্খ

চিন্তের অবসাদ ছর কর ছর

ভয়-ভীত জনে কর হে নিশঙ্ক।”

কীর্তন প্রসঙ্গে তিনি আরেক ধাপ এগিয়ে কীর্তনে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অনুভব করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতিটি চলা, বলা, কথা, সকল কিছুকে, তাছাড়া তাঁর সৌন্দর্য কেউ তাঁর হৃ'চোখ ভরে প্রত্যক্ষ করেছে। কখনো কৃষ্ণ দেবতা, কখনো বা মিত্র, কখনো বা দিক-প্রদর্শক, কখনো বা পার্থসারথি-এই সকল কিছুকে তিনি অনুভব করেছেন এবং তাঁর গানের মধ্যে তা ফুটিয়ে তুলেছেন। বিভিন্ন কীর্তনে শ্রীকৃষ্ণের ভালোবাসার কথাও তিনি ব্যক্ত করেছেন। তার মধ্যে কিছু গান আছে যেগুলি হৃদয়

থেকে তিনি রচনা করেছেন, যেমন এখানে কিছু গানের প্রসঙ্গ করা যেতে পারে--

‘ওরে নীল যমুনার জল
বল রে মোরে বল, কোথায় ঘনশ্যাম,
আমার কৃষ্ণ ঘনশ্যাম।’

এখানে আরেকটি গানের কথাও বলা যেতে পারে, তা হলো---

‘আমি কি স্থখে লো গৃহে রব
সখী গো,
আমার শ্যাম হলো যদি যোগী
ওলো সখী আমিও যোগিনী হব।’

কাজী নজরুল ইসলামের গজল বাংলা সাহিত্য ও সংগীতের এক অমূল্য সম্পদ। তাঁর গজলগুলোতে একদিকে যেমন ইসলামের হুফিবাদী চেতনা ও ধর্মীয় ভাবাবেগ প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি এতে নর-নারীর প্রেম এবং আধুনিক বাংলা গানের সুর এবং আঙ্গিক স্থান পেয়েছে। নজরুলের গজল বাংলা গানকে একটি নতুন মাত্রা দিয়েছে এবং বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। নজরুল রচিত কিছু উল্লেখযোগ্য ইসলামী গান ও গজল হলো-

“ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঝড়।”

এটি সম্ভবত তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় ইসলামী গান। এই গানটি ঝড়-উল-ফিতরের আনন্দ ও খুশির মুহূর্তকে ঘিরে রচিত।

আসলে কাজী নজরুল ইসলাম গানের জন্য গান রচনা করেননি, করেছেন জ্ঞানের জন্য। গানের মাধ্যমে শান্তি, মৈত্রী ও সম্প্রীতির কথা বলতে চেয়েছেন। তাঁর দেশাত্মবোধক গানগুলো পরাধীন ভারতের তরুণদের মধ্যে এক আলোড়নের সৃষ্টি করে। একদিকে যেমন বস্তুতাত্ত্বিক চিন্তাভাবনা তাঁর লেখনীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি ভাববাদী ও চিন্তাধারা তাঁর লেখনীতে প্রকাশ পেয়েছে। শুধুমাত্র ভাব বা বস্তুতাত্ত্বিক চিন্তা নয়, প্রেমের কথাও লিখেছেন এবং বিদ্রোহের কথাও লিখেছেন। একজন ব্যক্তির মধ্যে এমন অস্বাভাবিক গুণ কিভাবে থাকতে পারে তা ভাবলে শরীর শিহরিত হয়। তিনি বেড়াজালের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চাননি, তাঁর চিন্তাধারা সাধারণ মানুষের চিন্তাধারা থেকে অনেক উচ্চমানের ছিল। তিনি কুসংস্কারে বিশ্বাসী নন, তিনি বাস্তবতায় বিশ্বাসী। বর্তমানের এই বেড়াজাল থেকে মুক্তির উপায় শুধুমাত্র নজরুল ইসলামের চর্চা, এছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই বলে আমার মনে হয়।

কালীগানে নজরুল চেতনা

অপরাজিতা ভট্টাচার্য



শক্তির দেবী হিসাবে পূজিতা দেবী কালিকা। শাস্ত্রে উল্লিখিত তন্ত্র মতে যেসকল দেব-দেবীর আরাধনা করা হয়, তাঁদের মধ্যে দেবী কালী অন্যতম। কথিত আছে ঠগী-বর্গীরা বা ডাকাতি

দলের লোকেরা শক্তির দেবী কালীর উপাসক ছিলেন।

তাছাড়া শ্রী শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ, সাধক বামাক্ষ্যাপা, সাধক রামপ্রসাদ ছিলেন মা কালীর উপাসক। সেই সিদ্ধ মহাপুরুষদের সাথে দেবী মা'র বাৎসল্য সম্পর্ক ছিল। জনমনে কথিত আছে তন্ত্র শক্তির ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী হতে চাইলে অসীম নিষ্ঠা সহকারে দেবী কালীর পূজা করতে হয়। কিন্তু সেই অন্যতম তন্ত্র সাধনার প্রতীক হননি রবীন্দ্র সমসাময়িক কবি, ঔপন্যাসিক কাজী নজরুল ইসলাম। জাতিতে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তিনি কালী বিষয়ক অনেক গান রচনা করেছেন। নিজের মতো করে দেবীকে আরাধনাও করেছেন। তারজন্য তাকে কম কটাক্ষ শুনতে হয়নি। সমাজের বহু মানুষ তাঁকে নানান ধরনের কটু কথায় বিদ্ধ করেছেন। তারপরও তিনি থেমে থাকেননি, নিজের কলম চালিয়ে

গেছেন এবং বাংলা সাহিত্যে তাঁর এক বিশেষ অবদান কালী বিষয়ক গান রচনা করে গেছেন।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সময়ে বহু আলোচিত প্রতিভা হিসাবে বাংলা সাহিত্যে প্রতিভাত হয়েছেন। সমাজের নিপীড়িত, লাঞ্চিত, অবহেলিত মানুষকে ঠাঁই দিয়েছেন তাঁর কবিতায়। তিনি বলেছেন-

“গাহি সাম্যের গান-

যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান

যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রীষ্টান।

গাহি সাম্যের গান!”

বাংলা সাহিত্যে নজরুল ইসলামের কালীগান এক অনন্য মাত্রায় ফুটে উঠেছে। জনমত আছে, তাঁর তৃতীয় স্ত্রী ছিলেন হিন্দু ধর্মের, তার নাম প্রমীলা এবং যেহেতু তিনি হিন্দু ধর্মের তাই তিনি হিন্দু দেব-দেবীর পূজার্চনাও করতেন। নজরুল ইসলাম তাঁর স্ত্রীর দেব-দেবী বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়ে একাধিক কালী কীর্তন বা কালী গান রচনা করেছেন। তাই সমাজের কাছে তাঁকে অনেক কথা শুনতে হয়েছে। বলা যায়, নজরুল ইসলাম একাধারে বিদ্রোহী, সাধক, শ্মশানচর্চাকারী কবি হিসাবেও তাঁর গানে এবং কবিতায় দেবী কালীকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন, যা বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব মাত্রা দান করেছে। নজরুলের কাছে দেবী কালী শুধুমাত্র দেবী হিসেবেই পূজিতা নন, তিনি নারী সত্ত্বার প্রতীক এবং নৃত্যরতা ধ্বংস ও সৃষ্টির শক্তি হিসাবে কল্পিত। তাঁর প্রত্যেকটি কালী গান পর্যবেক্ষণ করলে আমরা বুঝতে পারব যে, নজরুলের অন্তপ্রাণে রয়েছে এক গভীর তাত্ত্বিক চেতনা, যা ধর্মীয় গণ্ডি পেরিয়ে এক সামগ্রিক মানবিক উপলব্ধিতে পৌঁছে।

নজরুলের কালী বিষয়ক গান মূলত তাঁর তন্ত্রসাধনা ও শাক্ত অনুভবের এক গভীর প্রকাশ। কোনো সময় তিনি দেবী কালীকে প্রেমিকা, কখনো আবার মা, আবার কখনো ধ্বংসের দেবী, আবার অনেক সময় শান্তির আশ্রয় হিসাবে কল্পনা করেছেন। তাঁর রচিত কালীগান গুলোতে দেখা যায় ভয়, প্রেম, আনন্দ, উন্মাদনা ও আত্মনিবেদনের অভিনব সংমিশ্রণ। এই গানগুলোতে নজরুল শুধুমাত্র তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নয়, আত্ম অনুভবেরও বিস্তারিত ঘটিয়েছেন। তাঁর মতে-

“আর কারে রাখবো ঠাঁই

বুকে তো মা রয়েছিস

তোরে নিয়ে আর কে আর ঠাঁই পায়?”

নজরুল ইসলামের এই কালী গান গুলো প্রচলিত ভাষা থেকে অনেকখানি আলাদা। রবীন্দ্রনাথ যেখানে কালীকে ধীর মাতৃস্বরূপা রূপে পূজা করেছেন, সেখানে নজরুল দেবী কালীকে উন্মাদিনী, ভাঙুরকারীনি, কখনো প্রেমিকা রূপে কল্পনা করেছেন। নজরুলের কালী কখনো শ্মশানে নৃত্যরত, রক্তমাখা, প্রেমিকের মতো আকুল আর অনেক সময় সর্বস্বহে মাতৃস্নেহে স্নেহশীলা। নজরুলের মতে-

“মা তুই রসের ঠাকুরান, তুই প্রেমের গরলপান,

তোর পায়ের ঘুঙুর শুন শ্মশানে লয়ে তান।”

নজরুল দেবী কালীকে শুধু হিন্দু দেবী হিসেবে না দেখে তাঁকে এক সার্বজনীন শক্তির প্রতীক হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন-

“আমি হিন্দু না, আমি মুসলমানও না। আমি গেয়েছি

ভালোবাসা, আমি গেয়েছি, শ্যামা মায়ে দানা।”

আলোচ্য বক্তব্যে নজরুলের ধর্মতত্ত্ব ও মানবতাবাদ স্পষ্ট। দেবী কালী তাঁর কাছে নির্দিষ্ট কোনো ধর্মের দেবী রূপেই সীমাবদ্ধ নন, তিনি সর্বশক্তিময়ী, যার সঙ্গে কবির ব্যক্তিগত আত্মিক যোগসূত্র বর্তমান। এই

সংযোগ কখনো পরম নির্ভরতামূলক, কখনোবা জিজ্ঞাসামূলক। কখনো আহ্বাদিত আবার কখনো সর্বসহা হাহাকারে পরিপূর্ণ। নজরুলের কালীগানের বিশেষ একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক হল গান গুলোর মধ্যে বিদ্রোহ ও প্রেমের অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন তিনি বিদ্রোহ কবিতায় বলেছেন-

“আমি চির-বিদ্রোহী বীর-

বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্ন শির।”

এরকম বিদ্রোহের অনুরণন আমরা নজরুল ইসলামের কালী গানেও লক্ষ্য করতে পারি।

“প্রলয়োন্মাসে মাতোয়ারা, মা, শ্মশানে নাচে ধারা ধারা
রক্তে তোর পায়ের আলতা।”

এখানে মা কালী প্রেম আশ্বাদনের মা নন, একজন ধ্বংসের প্রতিমূর্তি হিসাবে গণ্য হয়েছেন।

নজরুল তাঁর কালী গানগুলোর মধ্যে দার্শনিকতা, লোকাচার, তাত্ত্বিক সাধনা এবং লোকসংগীত এই চারটি স্তর মিলিয়ে গান রচনা করেছেন। তাঁর রচিত শ্যামা সংগীত এবং তাত্ত্বিক গান গুলোকে এক অনন্য মাত্রায় পৌঁছে দেন। যেমন-

“ভক্তির ভিখারী আমি মা, দাও তোমার চরণ

তব অভয়-অমৃত-ধারা করুক হৃদয়-ভরণ।”

এখানে মা কালী কেবল ভক্তির প্রতীক নন, তিনি ভয়ের মধ্যেও আশ্রয়দাত্রী মা। এই দ্বৈততাবোধ নজরুলের কাব্যিক কালী চেতনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

নজরুলের কালী গান শুধু ধর্মীয় স্তরে সীমাবদ্ধ না থেকে সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক স্তরেও বিস্তৃত। এই গানের মধ্যেও রয়েছে এক গভীর দার্শনিকতা, যেখানে জন্ম-জীবন-মৃত্যু এই ধারাবাহিক পরিণতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। নজরুলের এক গানের মধ্যে দেখা যায়-

“মরণ রচিলে তুই, তুই যে জীবন-শিখা

তোর রুদ্ররূপে মা, আমার প্রাণে দিখা।”

এখানে নজরুল ইসলামের দ্বৈততার আভাস পাওয়া যায়। গানটিতে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবন দানের তীব্র সম্ভাবনা এবং ধ্বংসের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির প্রেরণা বর্তমান, আসলে এই ধরনের দ্বৈততা নজরুলের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। আবার কালীকে কখনো তিনি ‘অগ্নিকন্যা’ আবার কোনো সময় ‘আদিম মাতৃত্বের চেতনা’ হিসাবে কল্পনা করতে পারি। তাঁর গানে দেখা যায়-

“আমি গিয়াছি ভৈরবী বেশে, কালো বরণে অঙ্গ ভেসে

থেলে বেড়াই মাতাল বেশে, ভয় কী রে? ভয় কী?”

নজরুলের কালী গান জাত পাত, ধর্মীয় ভেদাভেদ অতিক্রম করে অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। একদিকে একজন মুসলিম ধর্মাবলম্বী হয়ে হিন্দুদের দাবী নিয়ে গান রচনা করা তাঁর সাহসিকতা ও ধর্মিরপেক্ষতার প্রমাণ এবং অন্যদিকে এই গান গুলো হিন্দু শ্রোতার মধ্যেও সমান ভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। নজরুলের মতে-

“আমি সবার, আমি মানুষের। আমি মুসলমানেরও, আমি হিন্দুরও।”

অন্যদিকে নজরুলের রচিত কালীগানগুলোতে অনেকক্ষেত্রে তার ব্যক্তিগত হৃৎকণ্ঠ, যন্ত্রণার, তৃষ্ণার ও প্রেমাবোধের অভিব্যক্তি ঘটেছে। ‘মা’ ডাক ডাক দিয়ে তিনি কালীকে কাছে পেতে চান, কখনো আত্মার বন্ধু, কখনো প্রেমিকাকে খুঁজে ফেরেন সেই কালো মুখের আড়ালে। যেমন এক গানে তিনি বলেন-

“যেদিন প্রাণে ছিল গীতি, মা ছিল মুখে তোর নাম

আজ যে তোরে ডাকি মা, পাই না তোর অধরবাম।”

সার্বিকভাবে বলতে গেলে, নজরুলের কালী গান বাংলা সাহিত্যে এক ঐতিহাসিক ও বহুমাত্রিক অবদান। কালী এখানে শুধু হিন্দুদের পূজার

মূর্তি নন, তিনি বিদ্রোহের অনল, প্রেমের ছায়া, ভক্তির অনুরণন, তাত্ত্বিক শক্তি ও মানবিক মাতৃত্বের এক স্বরূপ হিসাবে প্রজ্জ্বলিত। নজরুল এই কালীকে তাঁর গানে, কবিতায়, চেতনায় এমনভাবে ধারণ করেছেন, যা বাংলা সাহিত্যে বিরল। এই কালী গানগুলোতে ধর্ম, সমাজ, দর্শন, রস, নন্দন- সব একত্র হয়ে একটি শক্তিশালী শিল্পরূপে গড়ে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত বলা যায়, নজরুলের কালী গান একাধারে কবির আত্মপ্রকাশ, ভাবনাজগতের বিস্তার, আধ্যাত্মিক অন্বেষণ এবং সমাজবোধের বহিঃপ্রকাশ। তাঁর কালী সেই অন্ধকারময় রাত্রির রাণী, যাঁর কোলে শুয়ে কবি পান শান্তি, যাঁর পায়ের ছোঁয়ায় ধ্বংস হয় পাপ আর উদ্বেগ, এবং যাঁর চরণধূলিতে কবি উপলব্ধি করেন চিরন্তন জীবনবোধের আলো। নজরুলের কালী গান তাই শুধু গান নয়, এটি এক অন্তর্গত দর্শনের আলোকবর্তিকা।

“আমি সব ছেড়ে মা ধরবো, তোমার রাঙা চরণ ছুটি

এই তো আমার ব্রত।”

-পান্নালাল ভট্টাচার্য

নজরুল সঙ্গীতে কানু

রঞ্জন কুমার ভট্টাচার্য



সাহিত্য জগতের আকাশ বাতাস যখন রবীন্দ্র ভাবধারায় মোহিত, সমসাময়িক কবির যখন ঘুরেফিরে রবীন্দ্রনাথকে করছেন অনুসরণ, নজরুল তখন সেই রবীন্দ্র বলয় ভেদ করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন মৌলিক প্রতিভায়।

নজরুল বিশেষজ্ঞ ডঃ শিশির করের ভাষায় “গদ্য ও পদ্য সব লেখাতেই তার লেখনী যেন অগ্নিবাহী, গানের ক্ষেত্রে তাঁর সৃষ্টি উজ্জ্বলতম।” বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী কাজী নজরুল ইসলাম এক মানবতার মহান প্রতীক, অবিস্মরণীয় কবি, এক অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন যথার্থ শিল্পী। আর একজন যথার্থ শিল্পী কোনও বিশেষ জাতিগোষ্ঠীর হতে পারেন না। তিনি মূলত মানুষের কবি, মানবতার কবি। তাইতো নজরুল লিখলেন --

“মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই,

নহে কিছু মহিয়ান।”

যেমন চন্ডীদাস বলেছিলেন ---

“সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।”

কবি নজরুলের সৃষ্টিরাজিতে রয়েছে বিচিত্র ভাব ধারার সংগীত---

তিনি লিখলেন--

“মোহান্নাদ নাম যতই জপি ততই মধুর লাগে।

নামে এত মধু থাকে কে জানিত আগে।।”

এখানে আমরা দেখতে পেলাম এসেছে মোহান্নাদের কথা এবং একজন মুসলমান কবি ইসলাম প্রভাবিত হবেন তা অতি স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি তো এখানেই থেমে থাকেননি। তিনি লিখলেন ---

“বলরে জবা বল,

কোন সাধনায় পেলি শ্যামা মায়ের চরণতলা।”-- সহ অনেক শ্যামা সংগীত। আর এ শ্যামা সংগীতগুলো যখন আমরা শুনি, তখন আমরা ভুলে যাই কবি নজরুলের কথা, আমাদের মনে ভেসে ওঠে তখন রামপ্রসাদের ‘বেড়ার ধারের’ মায়ের কথা। ঠিক এভাবেই তার সংগীতে মধ্যযুগ থেকে রাধা-কৃষ্ণকে অবলম্বন করে বা কৃষ্ণের বাল্যলীলাকে অবলম্বন করে যে ধারার সৃচনা হয়েছিল সেটা পুনর্নব হয়ে উঠল। তিনি তার গানে নানাভাবে কৃষ্ণ বা কানুকে অবলম্বন করে ভাষা দিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে চাই, এই ‘কৃষ্ণ’ শব্দটি প্রাকৃত হয়েছিল ‘কণ্ঠ’ প্রাচীন বাংলায় ছিল ‘কাহু’ এবং তা থেকে আধুনিক বাংলায় ‘কানু/

কানাই। এখানে এটাও উল্লেখ করতে চাই যে, ঋগ্বেদে ‘কৃষ্ণ’ শব্দটি পাওয়া গেছে এবং এই কৃষ্ণ চরিত্র নানারূপে আমাদের সাহিত্যে, আমাদের চিন্তায়, আমাদের লোকসংগীতে বিমূর্ত হয়ে উঠেছে।

এবার আমরা কানুকে অবলম্বন করে নজরুলের বিভিন্ন ভাবধারায় লেখা কয়েকটি গান নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার চেষ্টা করব।

ভক্তিতত্ত্বে বিশ্বাসীর জীবনের মহা আশ্রয় তার ইষ্ট-- কৃষ্ণ। কোনও সমস্যায় পড়ে মন যখন সেই সমস্যা থেকে পরিত্রাণের আশায় উতলা হয়ে ওঠে, তখন একমাত্র অবলম্বন কৃষ্ণ। ঠিক এরই প্রতিধ্বনি শোনা গেল নজরুলের লেখনি মুখে--

“শ্রীকৃষ্ণ নাম জপ অবিরাম/খির হও অধীর চিত্ত ওরে।

হরে কৃষ্ণ হরে, হরে কৃষ্ণ হরে/হরে কৃষ্ণ হরে, হরে কৃষ্ণ হরে।”

ভক্তি ধারায় আকুল হয়ে কবি লিখলেন--

“হৃদি পদ্মে চরণ রাখো বাঁকা ঘন শ্যাম।

বাঁকা শিথি পাখা নয়ন বাঁকা বঙ্কিমঠাম।”

একজন ইসলাম ধর্মাবলম্বী কবির ভাবনায় শিথি-পুচ্ছ ধারী গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের রাতুল চরণকে হৃদয়ে ধারণ করার আকুল প্রার্থনা আমাদের শুধু স্তম্ভিত করে না, মনে ভক্তিরসের ও সঞ্চার করে। ওই গানের শেষেই আছে-- “যেন নূপুর বাজে, বনে নয় শ্যাম, মন মাঝে যেন নূপুর বাজে।” কতটুকু কৃষ্ণ ভাবে ভাবিত হলে এ বাসনা মনে জাগে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আমাদের কানু রাখাল বালক। প্রতিদিন গোষ্ঠে যাওয়ার সময় মা যশোদা কানুকে হৃন্দর করে নানা সাজে সাজিয়ে দেন। কানু বাঁশি হাতে সখাদের সঙ্গে গোচারণে যান। এই সময়ে গোষ্ঠগামী কানুর যে রূপ তাও নজরুলের গানে মূর্ত হয়ে উঠেছে এভাবে--

“হেলে ছলে চলে বনমালা গলে গোষ্ঠ- বিহারী বনে বনমালী সাজে।

বঙ্কিম শিথি পাখা শোভিত অলক চন্দন তিলক ললাটে রাজে।”

এ গানেই রয়েছে ভক্ত মনের ভক্তির বর্ণনা --

“পথের ধুলি হরি চরন পরশে/হন শোভিত হরি - চন্দন হরষে

নিখিল ভক্তপ্রাণ চরণে নূপুর হয়ে রুমুঝু বাজে।”

রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের বিভিন্ন বর্ণনাও আমাদের সাহিত্যে উঠে এসেছে বারবার। কৃষ্ণ বিরহে রাধা কাতর, বিচ্ছেদ জ্বালায় জর্জরিত। আমাদের প্রচলিত লোকসংগীতে রাধার কণ্ঠে শুনতে পাই --

“আমার গলার হার খুলে নে ওগো ললিতে।”

কবি নজরুলের সংগীতেও কানুর অনুপস্থিতিতে বিরহিনী রাধার কণ্ঠে -

“ওগো ললিতে, আমি পারি না আর সহিতে,

শ্যাম শোকে প্রাণ জ্বলে গো সদায়।

বৃন্দাবন পরিহরি শ্যাম গিয়েছে মথুরায়,

বন্ধু বিনে আমার প্রাণ যায়।।”

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক ছন্দোময় গতিতে চলছে। কবি নজরুল কৃষ্ণকে এই ছন্দের ধারক ও বাহক হিসাবে অনুধাবন করেছেন। তাইতো তিনি লিখেছেন --

“খেলিছ, এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আনমনে খেলিছ।”

উল্লেখ্য, এখানে রয়েছে ‘ঋতম’য়ের পদধ্বনি।

ঠিক এভাবেই কবি কৃষ্ণকে নিয়ন্তা হিসেবে কল্পনা করে অশুভ শক্তিকে পরাভূত করতে আকুল আবেদন জানিয়ে গাইলেন --

“হে পার্থ সারথি, বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য শঙ্খ।”

আমরা মুক্তিকামী। সবসময়ই পরমেশ্বরের কাছে মুক্তি কামনা করি। কিন্তু বৈষ্ণবীয় কাব্যতত্ত্বের একটি মৌলিক দিক হচ্ছে বৈষ্ণব ভক্তরা মুক্তি চান না, চান ভক্তি। আমরা চৈতন্যচরিতামৃতে পাই --

“তন্মধ্যে মুখ্যবাস্তা কৈতব প্রধান।

যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান।।”

আমরা কবি নজরুলের লেখায় ও কৃষ্ণের প্রতি আকুল আবেদনে এই বৈষ্ণবীয় ভাবাদর্শের উল্লেখ পাই --

“লাথো জনম নিয়ে লাথো যুগ আসিব

নিত্য রসলীলা রসে ভাসিব

মোক্ষ মুক্তি আমি চাহিনা জীবন- স্বামী

হেরিব তোমারে শুধু নয়ন ভরে।।”

এভাবেই কবি নজরুলের লেখা বিচিত্র ভাবধারার অজস্র গানের মধ্যে কানুকে অবলম্বন করেও অনেক গান রয়েছে। কখনও কানুর বালালীলা, কখনও রাধা- কৃষ্ণের প্রেমের আলোকে, কখনও বা বিশ্ব নিয়ন্তা হিসেবে কানুকে করেছেন বিধৃত, আবার কখনও বৈষ্ণব ভাবধারায় ভাবিত হয়ে দেখেছেন কৃষ্ণকে।

কবি নজরুলের বিচিত্র ভাবধারার সংগীত সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে কাজী অনিরুদ্ধ বলেছেন -- “বৈষ্ণব যারা তারা রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলা ও গোষ্ঠ লীলার সুর-চিত্র দর্শনের সুযোগ লাভ করবেন নজরুলের রচনায়। শাক্ত যিনি তিনি শ্যামা মায়ের পায়ের তলায় নিজের মনটিকে একটি রাঙা জবা করে ধরে দিতে পারেন নজরুলের শ্যামাসঙ্গীতের খেলায় ভেসে। মুসলমান যিনি তিনি ঈদ মোবারক এর বাঁকা চাঁদ প্রথম দেখার আনন্দে আত্মহারা ভাষা খুঁজে পাবেন এই নজরুল গীতির ভান্ডার থেকেই।”

বিদ্রোহী কবি মানসে নারী

রাজর্ষি মোহন্ত



বাংলা সাহিত্যে নজরুলের প্রকৃত আবির্ভাব বিদ্রোহী কবিতার মধ্য দিয়ে। সমাজ জীবনের অবিচারের প্রতি মর্মস্পর্শী

প্রতিবাদই তাঁর কবিতার প্রধান উপজীব্য। যেখানে

মানবাত্মা অপমানিত, লাঞ্চিত হয়, সেখানেই বিদ্রোহী কবির কলম গর্জে ওঠে। তাই তাঁর কবিতা হয়ে উঠেছে শোষিত, বঞ্চিত, সর্বহারা মানুষের কবিতা। বস্তুত তাঁর সমগ্র কাব্য চেতনায় বিদ্রোহ, প্রতিবাদ বারবার সচেতন ভাবে ধরা পড়েছে। যেখানেই মানবতা লঙ্ঘন হয়েছে, সেখানেই তাঁর কলম গর্জে উঠেছে। তিনি মানুষকে দেখেছেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে। সমাজ সচেতনতা, সমকালীন গণতান্ত্রিক চেতনা ও সাম্যবাদী প্রত্যয় যেমন বারবার তাঁর কবিতায় ফুটে উঠেছে, তেমনি শ্রমজীবী মানুষের শোষণ, ধর্মীয় সংকীর্ণতা, নারী মুক্তির কথাও তাঁর কাব্য জগতে ব্যাপ্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। তাঁর সাম্যবাদ চাপিয়ে দেওয়া কোনো বিষয় নয়, হৃদয় লব্ধ বস্তু। তাঁর সাম্যবাদী কণ্ঠে যেমন সমাজের প্রত্যেক স্তরের মানুষের সমান অধিকারের কথা বলেছেন, তেমনি নারী ও পুরুষের সাম্যের বাণী ঘোষিত হয়েছে --

“বিথের যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর,

অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।”

নারী এবং পুরুষের সাম্যের এতো সাবলীল আহ্বান, নজরুল ছাড়া আর হয়তো কোনো কবির পক্ষে তা সম্ভব হতো না। তিনি মাতৃতন্ত্রের উপর পিতৃতন্ত্রের স্বতঃসিদ্ধ আধিপত্য মেনে নিলেন না। প্রতিবাদী সুরে বলে উঠলেন -- “সে যুগ হয়েছে বাসি,

যে যুগে পুরুষ দাস ছিলনাক’, নারীরা আছিল দাসী।”

উনিশ শতকে বাংলায় নবজাগরণের সূচনা হলেও, সেই নবজাগরণ ছিল বহলাংশে পুরুষকেন্দ্রিক। পুরুষের তুলনায় নারী শিক্ষার হার খুবই কম ছিল। অন্তঃপুরের চার দেওয়ালের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষমতা সকল নারীর ছিল না। বিংশ শতকে এসেও যেখানে মনে করা হতো নারী নরকের নরকের দ্বার, সেই রক্ষণশীল সমাজের বিরুদ্ধে কবি সোচ্চার হোন। নজরুল নারী শিক্ষার গুরুত্ব যথাযথভাবে বুঝতে পেরেছিলেন।

বিশেষত সমকালীন মুসলিম নারী সমাজের বেদনা ও বিড়ম্বনাকে কবি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন হৃদয় দিয়ে। যুগে যুগে নারীর পিছিয়ে পড়া, বন্দিদশা কবিকে ব্যথিত করেছিল। পুরুষ শাসিত সমাজে, যুগ যুগ ধরে নিষ্পেষিতা নারীর দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙে, স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠার কথা তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয় –

“মাথার ঘোমটা ছিঁড়ে ফেল নারী, ভেঙে ফেল ও-শিকল!”

এই ভাবনা তাঁর গানে ও ফুটে উঠতে দেখি –

“জাগো নারী জাগো বহি-শিখা/জাগো স্বাহা সীমন্তে রক্ত-টিকা।”

নজরুলের কবিতায় বারবার উঠে এসেছে নারী প্রসঙ্গ। কবি চেতনায় নারী কখনও মাতা, কখনও প্রিয়া, কখনও বধু, আবার কখনো আদিশক্তি। নারীকে কখনো ভালোবেসে কাছে টেনেছেন, আবার কখনো তাঁর হয়ে প্রতিবাদে জ্বলে উঠেছেন। বিদ্রোহী কবি কখনো নিজেকে কল্পনা করেছেন – “আমি বন্ধনহারা কুমারীর বেণী, তব্বী-নয়ন বহি,” আবার কখনো নিজের সমস্ত জালা-যন্ত্রণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, গৌরব লুটিয়ে দিয়েছেন নারীর চরণে –

“আমার বিজয়-কেতন লুটায় তোমার চরণ-তলে এসে।”

আবার পুরুষের রাজকীয় লাম্পটে নারীর পরিচয় যেখানে হয়ে যায় পতিতা, বারাস্তা; সেই নারীই কবির চোখে মাতা রূপে উদ্ভাসিত হয়েছেন। –

“কে তোমায় বলে বারাস্তা মা, কে দেয় থুতু ও-গায়ে?”

নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে বেড়ে ওঠা নজরুল সারা জীবন প্রতিবাদ করে গেছেন অন্যায়ে বিরুদ্ধে, অসাম্যের বিরুদ্ধে। নজরুল বাস্তব জীবনে যা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাই তুলে ধরেছেন তাঁর লেখনিতে। হিন্দু-মুসলমান বা নারী-পুরুষ কোনো বিভেদের ঘেরাটোপকেই মানতে চাননি তিনি। সর্বদাই সাম্যের গান গেয়ে গেছেন। লিঙ্গগত বৈষম্যের উর্ধ্বে গিয়ে তিনি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, নারী এবং পুরুষের সমতার অধিকারকে। সমাজে নারীকে ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দিতে চেয়েছেন তিনি। সর্বোপরি বলা যায়, হ্রদর্শী কবি বিংশ শতকে নারী মানসে যে স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি করেছেন, তা যেন আজ একবিংশ শতকে পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। –

“সেদিন সূর্য নয় –

যেদিন ধরণী পুরুষের সাথে গাইবে নারীরও জয়।”

অদৃশ্য বিদ্রোহী

অম্বিকা দাস পুরকায়স্থ



স্বাধীনতার প্রাঙ্কালে যখন দেশের অত্যাচারিত অবহেলিত লোকের সমুদ্রে রুখে দাঁড়ানোর সাহসিকতা কারোর ছিলনা তখন সেই অত্যাচারিত নিপীড়িত অসহায় লোকের হয়ে বিদ্রোহের কলম ধরেছিলেন তিনি। সমাজে ঘটে যাওয়া প্রত্যেক অন্যায়ে বিরুদ্ধে লড়াই করে যাওয়াই ছিল তাঁর জীবনের মূল উদ্দেশ্য। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান। তাঁর ছেলেবেলা অন্যান্য সাধারণ বালকদের মতো হয়ে উঠতে পারেনি। মাত্র ৮ বৎসর বয়স থেকেই তাঁকে সামলে নিতে হয়েছে পরিবারের দায়িত্ব কর্তব্য। শৈশবের রেশ কাটিয়ে যখন কৈশরকালে পা রাখলেন তখন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ভারতের পরিস্থিতি বিদ্রোহের আগুন তাঁর রক্তের শ্রোতে প্রলয় এনে এক প্রলয়ঙ্কারি রুদ্ররূপে নতুন মানবের পুনর্জন্ম হয়, এবং সেই পুনর্জন্মের পর থেকেই আমরা তাঁকে বিদ্রোহী কবি বলে সম্বোধন করি, তিনি আর কেউ নন কাজী নজরুল ইসলাম যার রক্তে বহিত স্বদেশপ্রেমের ভাবনা। বর্তমান প্রজন্মের বিশিষ্ট কবি যাকে রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক হিসাবে গণ্য করা

হয় সেই ব্যক্তিটিই এককালে রুটির দোকানে দিনমজুরি করে সংসার চালাতেন এবং কাজের ফাঁকে বিরাম না নিয়ে কবিতায় মত্ত হয়ে যেতেন।

১৯২২ সালে যখন সমগ্র দেশে অসহযোগ আন্দোলনের বিক্ষোভ গর্জে উঠে তখনই তাঁর লেখা বিখ্যাত কবিতা ‘বিদ্রোহী’ প্রকাশিত হয় – “আমি চির বিদ্রোহী বীর- / বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা!”

যা ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতকে তেজস্ক্রিয় করে তোলে। নজরুলের লেখা “আনন্দময়ীর আগমনে” উনাকে কারাগারের বন্ধ দেওয়ালে আটকে রাখে কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর হাতের কলম থামেনি।

সেই সময়ের প্রসিদ্ধ লেখক-লেখিকাদের মতো তাঁর সেই রাজ-ঐশ্বর্য ছিলনা। জীবনের প্রতিটি ক্ষণ তাঁকে যুদ্ধ ক্ষেত্রের যোদ্ধা হয়ে দাড়িয়ে কাটাতে হয়। তাঁর চার সন্তানের মধ্যে তিনজনই অনেক অল্প বয়সে মারা যান। স্ত্রী প্রমীলা দেবী মানসিক ও শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। একটা সময় প্রিয়জনহারা জীবন তাঁর জীবনটাকে শুষ্ক বৃক্ষ রূপে গড়ে তোলে এবং ধীরে ধীরে নিজেও একদিন পিক’স ডিজিজ নামে এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হন ফলস্বরূপ নানা বিদ্রোহের গান, ছড়ার গান, শ্যামাসঙ্গীত, রাধা কৃষ্ণের প্রেমকাহিনি ইত্যাদির রচয়িতা বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। তিনি রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলাকে শুধু ধর্মীয় ভাবনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং মানবিক প্রেম, প্রেমের ব্যথা-বেদনা, বিরহ ও মিলনের প্রতিচ্ছবি হিসেবেও দেখেছেন।

“হারানো হিয়ার নিকুঞ্জপথে কুড়াই ঝরা ফুল একেলা আমি।

তুমি কেন হায় আসিলে হেথায় স্থখের স্বরগ হইতে নামি।।”

নজরুল ইসলামের এই গানটি এক অসাধারণ প্রেমময় এবং বেদনাময় গান। এই গানটি প্রেম, স্মৃতি, হঠাৎ দেখা, এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের এক গভীর প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলে। এই গানের অর্থ তিনি বোঝাতে চাচ্ছেন যে আমি একা বসে আছি আমার হারানো হৃদয়ের গোপন বনে, যেখানে পড়ে থাকা ঝরা ফুল কুড়াচ্ছি। এখানে ‘ঝরা ফুল’ মানে অতীত স্মৃতি, প্রেমের ক্ষণগুলি যেগুলো হারিয়ে গেছে।

জীবনের বার্ষিক্য পথে যখন পাড়া দিলেন তখন ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মজিবুর রহমানের আমন্ত্রণে নজরুল ও তাঁর পরিবারকে বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয় এবং জীবনের বাকি সময়টুকু সেখানেই কাটিয়ে যান। অবশেষে ২৯ আগস্ট ১৯৭৬, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন, তাঁর গান থেমে গেল, কিন্তু সুর আজও বাজে প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে। তাঁর বিষয়ে লেখার জন্য কোনো লেখকের কলম থামতে চাইবে না। অবশেষে এটাই লিখব- যে জীবনে বিদ্রোহ আছে, ভালোবাসা আছে, কষ্ট আছে, সৃষ্টি আছে- সেই জীবন নজরুলের।

পরবর্তী আলোচনা সংখ্যার বিষয়

কবি জীবনানন্দ দাশ

প্রকাশিত হবে আগস্ট মাসের শেষ শনিবার

মাসিক বৈঠকের এই আলোচনা সংখ্যা বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য কর্তৃক উত্তরসূরি থেকে প্রকাশিত এবং স্কলার পাবলিকেশনস্ থেকে মুদ্রিত।

আলোচনা সংখ্যাটি উত্তরসূরি কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত।